সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

সরলাবালা সরকার

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৩৬৫

উৎসর্গ

পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন

শ্রীমান সৈয়দ মুজতবা আলীকে

ভূমিকা

অতি অল্পবয়স থেকেই অর্থাৎ পাঁচ ছয় বৎসর বয়স থেকেই আমার সাহিত্যচর্চ্চার হাতে খড়ি আরম্ভ হয়।

প্রথমে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কাশীরাম দাস এবং কীর্ত্তিবাস প্রভৃতি, তারপর ধাপে ধাপে উঠেছিল 'পলাশীর যুদ্ধ', হেমচন্দ্রের "আর ঘুমাওনা দেখ চক্ষু মেলি" প্রভৃতি কবিতার রসাস্বাদনে, তার পর ভারতীতে প্রকাশিত 'দীপনির্ব্বাণ' 'হুগলীর ইমাম বাড়ী' আর চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের 'টমকাকার কুটীর' প্রভৃতিতে।

ক্রমশ কবি অর্থাৎ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচয় হ'ল। 'তরল জলদে বিমল চাঁদিমা সুধার ঝরণা দিতেছে ঢালি', 'থাকিয়া থাকিয়া বিজনে পাপিয়া কানন ছাপিয়া তুলিছে তান', এই যে অপূর্ব্ব সুরের ঝঙ্কার আমাকে যেন সেদিন এক নূতন জগতের সন্ধান এনে দিয়েছিল।

সে জগৎ সাহিত্য-জগৎ। বাহিরের সৃষ্টিকে মন যে বর্ণরঞ্জনে রঞ্জিত করিয়া তাহাকে নূতন ভাবে জীবন্ত করে, নব রূপায়নে রূপায়িত করে, সে জগতে বাহিরের দৃশ্যমান রূপ মনের অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়া এক নূতন ভাবময় রূপ ধারণ করে তাহাই সেই সাহিত্য-জগৎ।

আমার মনের ভাব যে তখন কোন্ পথ ধরিয়া চলিয়াছিল এখন তাহা স্মরণ করা অবশ্য সম্ভব নয়, তবে এটুকু মনে আছে সে সময় কবিকে মনে মনে পরমাত্মীয় বলিয়াই অনুভব করিয়াছিলাম।

পরে আমার পরম সৌভাগ্য যে, কবির সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিবার ও তাঁহার সহিত আলোচনা করিবারও সুযোগ ঘটিয়াছিল।

অন্যান্য কবিগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার সমস্ত গ্রন্থগুলিই আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়ালের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশবাবুর সম্বন্ধে গিরিশ লেকচারে সুযোগ্য সাহিত্যিকগণ

নানাভাবে বলিয়াছেন, তথাপি আমি তাঁহার রচনার মধ্যে যে বিশেষ ভাবটি অনুভব করিয়াছিলাম তাহাই কিছু লিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি।

এই প্রচেষ্টার কতদূর সার্থকতা হইয়াছে, আজিকার দিনের আধুনিক সমাজে আমার এই সাহিত্য সম্বন্ধীয় অনুভূতির মূল্য কি, তাহা আমার নিজের দিক দিয়া ধারণা করা সম্ভব নয়, সেইজন্য সেই মূল্য নির্দ্ধারণের ভার পাঠকগণের উপরেই অর্পণ করিলাম, ইহাই আমার নিবেদন।

সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মানুষের যাহা প্রাচুর্য্য, যাহা ঐশ্বর্য্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে সাহিত্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই।"

—মানুষ যে কি চায়, ও কতখানি চায়, মানুষের আত্মীযতাবোধ যে কতদূর প্রসারিত হইতে পারে সাহিত্যই তাহার পরিচয় ক্ষেত্র। প্রাণধর্ম্মী মানুষ সাহিত্যের মধ্য দিয়াই এই বিপুল বিশ্বের বহু বিভিন্নতার মধ্য দিয়া এই আত্মিক সংযোগ রক্ষা করিয়াছে, এবং তরু, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ, এমন কি জড় বস্তুতেও সেই এই প্রাণধর্ম্মের আরোপ করিয়া তাহাকে আত্মীয়পর্য্যায় ভুক্ত করিয়াছে। কবি কালিদাস মেঘকেই প্রিয়াসন্নিধানে বার্ত্তা প্রেরণের দূতরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। এইভাবে সাহিত্যেই সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালে এক পরম ঐক্যের সন্ধান দান করিয়াছে। সাহিত্য সম্বন্ধে এই সত্যটিই আমার মনে হয় একটি সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য,—এবং সাহিত্যই জাতি, বর্ণ, ভাষা, ও দূরদেশের বিভিন্ন সৃষ্টির সকল বিভিন্নতার মধ্যে সংযোগসূত্র স্বরূপ।

লেখিকা

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের গাজিপুরের এক সম্রান্ত বৈদ্য পরিবারে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

তাঁহার পিতাব নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। আদি নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যবসায় উপলক্ষে গাজিপুরে গিয়া বসবাস করেন। তিনি মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন, সেজন্য বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর নাবালক পুত্রগণকে লইয়া তাঁহার পত্নী আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন কিন্তু এই মহিলা নিজেব চেষ্টায় পাঁচটি পুত্রকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেন এবং কন্যাটিকেও পাত্রস্থা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতারা সকলেই মাতৃভক্ত ও মাতৃনির্ভব পবায়ণ ছিলেন।

ইংরাজি ১৮৭২ খৃস্টাব্দে বাঁকিপুর (পাটনা) কলেজিয়েট স্কুল হইতে দেবেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা (এনট্রান্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় একাদশ স্থানীয় হন।

বি এ. পরীক্ষায় ইংবাজীতে অনার্স লইয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে private student রূপে। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে তিনি ইংরাজীতে এম. এ. পরীক্ষা দিয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তিনি সংস্কৃতেও এম. এ. দিবেন ইচ্ছা কবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, তবে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে করিয়াছিলেন।

কর্ম্মজীবনে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার চারি ভ্রাতা সকলেই যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দা হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে গাজিপুবে ও পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করেন, কিন্তু অল্পবয়স হইতেই তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চায় অনুরাগ জন্মিয়াছিল, সেজন্য ওকালতীর সঙ্গে কাব্যচর্চ্চাও করিতেন।

১৮৮০-৮১ খৃস্টাব্দে গাজিপুরে থাকিবার সময় তাঁহার তিনখানি ছোট ছোট কাব্য প্রকাশিত হয়, কাব্য তিনখানির নাম 'ফুলবালা' 'উর্ম্মিলা' ও 'নির্ঝরিণী'। তখনকার দিনের সংবাদপত্রে এই কাব্যগুলি সমালোচিত হয় ও প্রশংসা লাভও করে।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন:

"প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে—আমি তখন গাজিপুরে অবস্থান করি। একদিন শুনিলাম, কবিবর রবীন্দ্রনাথ গাজিপুর আসিয়াছেন। রবিবাবু আমার 'ফুলবালা' কাব্য ও 'উর্ম্মিলা' কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার 'নির্ঝরিণী' কাব্যের 'আঁখির মিলন' কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ না থাকিলেও পত্রের দ্বারায় পরিচয় ছিল। তিনি আমার 'উর্ম্মিলা' কাব্যের সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসান হইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে এ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি' ইত্যাদি। গাজিপুর অবস্থান কালে রবিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। সে এক মহা আনন্দের—আমার জীবনের ষোল পূর্ণিমার দিন ছিল। নিত্য উৎসব, নিত্য পার্ব্বণ। আমার অপ্রকাশিত কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতাম—তিনি আনন্দিত হইয়া শুনিতেন। তিনিও তাঁহার অপ্রকাশিত নূতন কবিতাগুলি আমাকে শুনাইতেন, আমি হর্ষবিহ্বল হইয়া শুনিতাম। তখনকার রবিবাবুর যেমন দেবকান্তি, তেমনই সুন্দর কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি। আমরা দুইজনে একপ্রকার Mutual Adulation Society গড়িয়া তুলিয়াছিলাম।

"একদিন রবিবাবু আমাকে বলিলেন, 'ভারতী সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এখানে আছেন। আপনার কতকগুলি কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হইবার জন্য দিন।' অনুরোধ শুনিয়া আমিও কৃতার্থ হইলাম। কারণ ইতিপূর্ব্বে আমার কোন কবিতা অথবা প্রবন্ধ কোন প্রখ্যাত পত্রিকায় বাহির হয় নাই। তখন স্বর্ণকুমারী দেবী'র খুব নাম—'ভারতী'র খুব নাম। সম্পাদিকা অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা। যেমন তাঁহার নিজের রচনাপটুতা, তেমনি প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে দক্ষতা। খুব খাঁটি

জিনিস না হইলে পত্রিকায় স্থান পাইত না। আমিও ভ্যাজাল চালাইতে পারি নাই।

"সেই সময়ে আমার 'অদ্ভুত সুখ', 'অদ্ভুত বহুরূপী', 'অপূর্ব্ব অভিসার', 'নাগা-সন্ন্যাসী', 'গাজিপুর' ও 'গোলাপসুন্দরী' নামক কবিতাগুলি ভারতীতে স্থান পাইয়াছিল।"—'স্মৃতি' 'ভারতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।"

১২২৫ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা (ইং ১৮৮৮) ভারতীতে 'অদ্ভুত যৌবন' ও 'অদ্ভুত সুখ' নামে দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়, সম্ভবতঃ এই দুটিই দেবেন্দ্রনাথের মাসিকে প্রকাশিত প্রথম রচনা। ইহার পর তাঁহার গদ্য ও পদ্য বহুরচনা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' পত্রিকা যখন 'কল্পদ্রুম' কথাটি বর্জ্জন করিয়া 'সাহিত্য' নাম ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইল তখন হইতেই তাহাতেও দেবেন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল।

'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। ১২৯৬ সালের মাঘ মাসে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সপ্তম সংখ্যা হইতে ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। সুরেশচন্দ্র তাঁহার সম্পাদকের নিবেদনে বলিয়াছেন, 'পূর্ব্বে যিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন, তিনি ইহাকে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম'—নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। আমাদের অতদূর উচ্চ আশা নাই। জগৎ, সাহিত্যের অন্তর্গত নয় কি? অতএব 'কল্পদ্রুমে'র ন্যায় যিনি যাহা চাহিবেন, তাঁহাকে সেইরূপ সাহিত্য দিয়া তৃপ্ত করিব আমাদের এমন দুরাশা নাই।" সমাজপতি মহাশয়ের বাচন-ভঙ্গী এইরূপই ছিল। তাঁহার মাসিক 'সাহিত্য সমালোচনা'র খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রবন্ধের নব নব ধারার সৃষ্টি বিষয়েও সমাজপতি মহাশয় বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন, তাই তরুণ সাহিত্যিকগণ তাঁহার 'আসরে' আসিয়া যোগ দিতেন এবং অল্পকালের মধ্যে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথের 'অপূর্ব্ব' কবিতাগুলি একসঙ্গেই 'ভারতী' ও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে তিনি 'আমি কে' শীর্ষক কবিতায় যে ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন তাহার গৌরচন্দ্রিকার সহিত সেটি এখানে

উদ্ধৃত করিতেছি। অবশ্য গৌরচন্দ্রিকাটির ভাষা আমার স্মরণ নাই তবে তাহার ভাবার্থটি এখানে দিতেছি ;—(এখন বাংলাদেশ পাশ্চাত্যের পূজক, তাই লেখকগণ তাঁহাদের নিজের দেশের নামে সন্তুষ্ট হন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বাংলার সেক্সপিয়র, কেহ বা বাংলার মিল্‌টন, কেহ বা বাংলার বায়রন বা শেলি নামে নিজেকে ও অপরকে পরিচিত করেন। তাই আমি ভাবিতেছি, আমি তবে কে ?)

আমি কে ?

এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,
তাহারি মুরতি মোর হৃদয়েতে রাজে।
পাটল অধরে তার,
চঞ্চল ধূসর কেশে
ডুবায়ে তুলিকা ঘন আঁকি সেই ছবি—
অতি ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর কবি!

এক যে কুলীন কন্যা আছে বাঙ্গলায়,
আশার প্রদীপ ধরি জীবন কাটায়!
দেহ মালঞ্চের তার
অর্ঘ্য পুষ্প ঝরে যায়,
হে দেবতা, কোথা তুমি ? আঁকি সেই ছবি
ক্ষুদ্র আমি বাঙ্গালীর কবি!

এক যে সধবা আছে, কোলে পিঠে যার—
শিশুস্বর রেখে গেছে ফুলছবি তার!
সীমন্ত-সিন্দূরে তার
চরণ অলক্ত-রাগে
ফলাইয়া নব রাগ আঁকি আমি ছবি,
চির দুঃখী বাঙ্গালীর কবি!

এক যে শেফালী আছে,   হেরি যায় হাস
যৌবন নিকুঞ্জে মোর   চির মধুমাস।
দাঁড়ায় চটুল দাসী
সেফালীর তলে আসি,
ওর ও চক্ষে দেব হাসি,   আঁকি সেই ছবি,
ক্ষুদ্র আমি বাঙ্গালীর কবি!

গ্রামের এ কূলে কূলে   প্রাণের অশ্বত্থ মূলে
যতদিন বহিবে জাহ্নবী,
খোকারে লইয়া বুকে   প্রিয়ারে আলিঙ্গি সুখে
বুক পুরি আঁকিব এ ছবি,
ক্ষুদ্র আমি বাঙ্গালীর কবি!

তোমরা সকলে গেলে   আমারে একলা ফেলে,
স্বদেশের মায়া ভুলে, অরণ্য অটবী—
এখনো এ দেশ নয়,   এখনো জাহ্নবী বয়,
শরতে চাঁদনি হাসে আঁকি সেই ছবি,
দীন দুঃখী বাঙ্গালীর কবি।

সম্ভবতঃ এ কবিতাটি ১২৯৮ সালে দ্বিতীয়বর্ষের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

১২৯৭ কার্তিক সংখ্যা 'ভারতী' ও 'বালকে' তাঁহার 'হর-শিকার' নামে একটি কবিতা বাহির হয়। নাম স্বাক্ষরের স্থানে—শ্রীউকীল—স্বাক্ষরছিল।

'হরশিঙ্গার' শব্দটি শিউলী ফুলের নাম। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানীরা শিউলী ফুলকে হরশিঙ্গার বলে।

দেবেন্দ্রনাথ এলাহাবাদে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই কবিতায় তিনি প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতে ওকালতীর পুরস্কার লাভ করিয়া যেভাবে একাধারে উকীল ও কবি হইয়াছিলেন তাহারই বিবরণ আছে। কবিতাটি অতি সুন্দর কিন্তু দীর্ঘ, সেইজন্য তুলিয়া দিবার প্রলোভন সত্ত্বেও সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা সম্ভব হইল না, স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলাম :

"আমার বন্ধুরা সবে প্রায় বলাবলি
করে থাকে, কভু স্নেহে কভু বা বিরাগে,
বিপুল ভ্রূকুটি করি, ভাল আকুঞ্চিয়া,
কহে থাকে—মানে মানে ছাড় ওকালতি।
উকীলের হৃদয়টি মরুভূ সমান,
ফোটেনা কুসুম যেথা, দোলেনা ব্রততী
উছলে না উৎস—বালুরাশি ধূ ধূ ধূ ধূ
হায় চারিদিকে। * * * * * *

তাই কি? তাই কি হায়? বলরে সংসার,
নাহি কি তুলিস্ নিত্য কন্ধকরে তোর
বনপুষ্প, গাঁথিবারে সারস্বত মালা?

* * *

বল্ বল্ ওলো উজ্জয়িনী!
বাণিজ্য-ব্যবসাপূর্ণ, ভোগ-স্পৃহাময়ী
তোর সেই নগরীর অন্ধকার রাশি
কে হরিত? বিক্রমের নবরত্নাবলী
গেছে চলি, গেছে চলি! কে দিবে গো
পুরি এ সমস্যা? আমি মূর্খ! জানিনা জানিনা!

জানিবারে চাও যদি যাও শীঘ্র যাও,
কুবেরের বরপুত্র, মঙ্গল সাহুজি
আছে বসি—গিয়া তুমি সুধাও তাহারে।

সাহুজি মক্কেল মম , করিবে যতনে,
আতর এলাচ দিয়., বসায়ে গদীতে,
শিষ্টালাপে শিষ্টালাপে যত্ন যথাবিধি।

ইহার পর সাহুজির কুঠির বর্ণনা আছে, প্রকাণ্ড বাড়ি, বাহিরের দেয়ালে নানা শিল্পচাতুর্য্য, দুয়ারের কাছে প্রকাণ্ড এক হাতি বাঁধা আছে। পথে ঘাগরী পরা মেয়েরা পিতলের কলসীতে জল ভরিয়া মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছে, আব হাতিটি—

"কাড়ি লয়ে জলপূর্ণ পিত্তল কলসী
যুবতীর শিব হ'তে—দুরন্ত আহ্লাদে
চারিধারে ছড়াইছে জলেব ফোয়ারা!
যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী আকুলি ব্যাকুলি,
আর্দ্রকেশে, আর্দ্রবেশে, আগু পিছু চাহি
রাস্তা ছাড়ি গলি মুখে যাইতেছে ভাগি!

প্রকাণ্ড আঙ্গিনা, চারিধারে ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি,

দীপক, ঝালর, ঝাড়, দেয়াল গিরি
চারিধারে ছড়াছড়ি—* * * * *

তাহারই মধ্যে আছে আঙ্গিনার একপাশে একটি শিউলী ফুলেব গাছ,

কি সাহসে সঙ্গী হারা একমাত্র তরু
কি সাহসে রুক্ষ দেহ একটি শেফালি
খাড়া আছে আঙ্গিনার মাঝে।

ইহা বিস্ময়ের কথা, কেননা কোন হিন্দুস্থানী—

"ভ্রমে কি কৌতুকে
নিজ বাস্তভবনের আঙ্গিনার মাঝে

রোপে কভু পুষ্পতরু ? কদাকার রীতি !
সে দোষেতে দোষী শুধু দুর্ব্বল বাঙ্গালী !

তবুও কেন যে কুবেরের বরপুত্র সাহুজি গাছটিকে উপড়াইয়া ফেলেন নাই কবি সেই কাহিনীই শুনাইতেছেন :

"শোন তবে মন দিয়া শেফালী কাহিনী।
একদিন, কোন এক কার্য্যের উদ্দেশে
গিয়াছিনু সাহুজির ওই সে কুঠীতে
সন্ধ্যাকালে। * *

তখন সাহুজি, "ওই দুঃখী শেফালির দিকে
তাকাইয়া রাখি ভুজ মসৃণ উদরে
সরোষে বলিতেছিলা কুঠির মুনিবে—
'কতবার মুনিবজি দিয়াছি হুকুম
উপাড়ি ফেলিয়া দিতে এ হরশিঙ্গারে,
তবু কেন খাড়া আছে এ হরশিঙ্গার ?
ঘরের পরাণী তব ভাল কি হে বাসে
মুনিবজি, ভালবাসে রঙাইতে শাড়ি
এই হরশিঙ্গারের বাসন্তী কুঙ্কুমে ?"

ইহার পর সাহুজি হুকুম দিলেন "কাল যেন আর এ গাছটিকে এখানে খাড়া থাকিতে দেখিতে না পাই।"

* * "ব্যস্ত ছিলা মুনিব-শাসনে
সাহুজি, আমার আসা পান নি দেখিতে।
আমিও ছিলাম ব্যস্ত—দেখিতে ছিলাম
মলিন মুখশ্রী আহা দুঃখী শেফালীর !
শুনিতেছিলাম আমি—শেফালি-ভূষণ
মোদা আঁখি কুঁড়িগুলি, দুলি দুলি দুলি

কহিছে সন্ধ্যারে যেন সকরুণ স্বরে
শুনিলে তো? আর সখি কি হবে ফুটায়ে?"

"কি বলিলি, বল্ বল্ কি হবে ফুটায়ে?
কি হবে ফুটায়ে? হায়, হায়রে পাগল,
বুক খালি অঙ্ক খালি করি প্রকৃতির
করি খালি হায় তার ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার
তোরা কি পলায়ে যাবি? আমার নয়ন
সহসা হইল আর্দ্র! বোধ হ'ল যেন
প্রকৃতি নিজের হাতে, আদরে যতনে,
শামলা পরায়ে দিল আমার মাথায়।
প্রকৃত উকীল-কবি সাজিয়া তখন
অগ্রসরি ধীরে ধীরে সাহুজির কাছে
করিনু সেলাম।

আইয়ে উকীল সাহেব!
লে আও, লে আও ফিরা পান ও এলাচি।"
আমি কহিলাম তাঁরে, 'কি দোষে সাহুজি,
উপাড়ি ফেলিয়া দিবে এ হরশিঙ্গারে?'

"কেঁও বাবু?"—কহি শুধু এই দুটি কথা,
সজোরে তরুর দুটি ক্ষীণ শাখা ধরি
সাহুজি দিলেন নাড়া,—দুই এক কুঁড়ি
মরমে আঘাত পাই অভিমানে যেন
খসিয়া শুইল গিয়া ধরণী উরসে।

"কই বাবু, এত নাড়া দিলাম তরুরে
মোহর খসিল কই?" কহিলা সাহুজি।

* * *

"মোহর বসিল কই ? সাহুজি, চাহিয়া
দেখ, দেখ বৃক্ষপানে ; ওরুবে জুড়িয়া
শিরে চক্ষে স্কন্ধে বক্ষে তুলিছে যে কুঁড়ি
প্রত্যেকটি হীরা, চুণি, পান্নার অপেক্ষা
মূল্যবান ; কোথা লাগে তামা, রুপা, সোনা !
ভগবত্ নাম আছে প্রত্যেকে অঙ্কিত।
বৃক্ষের প্রসূনগুলি ফুটে উঠে যবে,
কি সৌন্দর্য্য, কি মাধুরী আঙ্গিনার মাঝে
রাজে নিত্য ! সত্য বলি মানিও সাহুজি,
তোমার অজ্ঞাতসারে, তোমার প্রাণেতে
সেই সৌন্দর্য্যের মৃদু কমনীয় রশ্মি
প্রবেশি করে গো হিয়া করুণা প্লাবিত !
সেই সে নেশার ঘোরে প্রতি শনিবারে
দীন দুঃখী কাঙালেরে করে থাক তুমি
অন্নদান ; করে থাক মন্দির প্রতিষ্ঠা
দেবোদ্দেশে ; কত শত শীতার্ত্ত ব্রাহ্মণে
রেজাই বিলাও তুমি , চঞ্চলা কমলা
তাই সে নিগড়ে বাঁধা তোমার দুয়ারে।"

"এই যে মহল্লা জুড়িয়া শেফালির সৌরভ, এই সৌরভে শত্রুও মিত্র হয়।"

"ওই যে মোহন কাঁদু তব প্রতিবেশী,
যার সাথে মকোদ্দমা হয়েছিল তব
গত বর্ষে, শত্রুতা,—সেও হয়ে যায়
মহামিত্র, পশে যবে নাসারন্ধ্রে ওই
হরশিঙ্গারের গন্ধ মকরন্দে ভরা।"

"মহাশব্দে সাহুশ্রেষ্ঠ উঠিল হাসিয়া
বাক্য শুনি মহোল্লাসে মোর পানে চাহি।
আমি পুনঃ কহিলাম সৌরভে সৌরভে
যুড়ি এ—সুষমাপূর্ণ অট্টালিকাপুরী,

*   *   *

শ্বেত কবুতর যথা পক্ষের ঝাপটে
দূর করে আধি ব্যাধি, এ পুষ্প তেমতি
ধরে গো অদ্ভুত শক্তি! অদ্ভুত অমৃতে
দেয় ভরি প্রাণকুম্ভ। এই নেশাঘোরে
আজিকে সাহুজি তুমি প্রবেশিবে যবে
অন্তঃপুরে, পত্নী, ভগ্নী, তনয়, তনয়া
দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যে হবে তোমার চক্ষেতে
ভাস্বর। * * *

এইরূপ ছন্দ বন্ধে বাক্যের বিন্যাসে
ভিজাইনু সাহুজির রৌপ্যময় হিয়া।

সাহুজি কহিল মোরে, "উকীল সাহেব,
আমি মানিলাম হার (ধন্য ওকালতি)
তোমারই ডিক্রি মায় সমস্ত খরচা।

এইরূপে দুরাদৃষ্ট গরীব তস্কর
খণ্ডায়ে প্রকৃতি-দত্ত অদ্ভুত শামলা
রাখি মাথে, মহা হর্ষে ফিরিনু আলয়ে।

•   •   •

আত্মার প্রসাদে
যে আহ্লাদে পূর্ণ হল আমার এ হিয়া
বর্ণের তুলিকা দিয়া চিত্রিব কেমনে।"

কবি এখানে নিজ কৃত কতকগুলি অতীত দিনের সৎকার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—পপার নালিসে জয়লাভ করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাসকারী রাক্ষসের হাত হইতে দরিদ্রকে তাহার হৃত সর্ব্বস্ব ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার যে আনন্দ হইয়াছিল, গঙ্গার প্রবল প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া মৃতকল্প বালককে উদ্ধার করিয়া তাঁহার যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা হইতেও অনেক অধিক আনন্দ হইয়াছে ছোট শেফালি গাছটিকে কুড়ালের আঘাত হইতে বাঁচাইয়া।

সেইদিন হ'তে,

আমার চিত্তের গেলরে গেলরে তৃষ্ণা
বহুকাল ব্যাপী মিটিয়া, চিত্তে মোর
হরিচন্দনের যেন প্রাণময়ী ছায়া
পড়িল সুধীরে। * * *

মধুর করবী কুঞ্জ প্রাণের মণ্ডপে
মধুপে মধুপে ভরা, বিরলে বসিয়া
রচে তারা মধুচক্র। হায়, কিন্তু তারা
নিত্য-ব্রত ত্যাগ করি সেইদিন হ'তে
ভাণ্ডারে, শয়ন কক্ষে, অলিন্দে অলিন্দে
পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমে সদা গুঞ্জরি গুঞ্জরি।"

কবি বলিয়াছেন, বোধ হয় সেই শেফালির সৌরভ,—প্রকৃতি যে সৌরভ উকীল-কবিকে পুরস্কার-রূপে দিয়াছিলেন, সেই সৌরভের আঘ্রাণ পাইয়াই তাহারা এইভাবে মকরন্দ-আশায় খুঁজিয়া বেড়ায়।

এই কবিতার ভিতর দিয়া আমরা কবির যে পরিচয় পাই তাহাতেই তিনি আমাদের পরিচিত ও আত্মীয় হইয়া যান। এলাহাবাদবাসী সেই উকীল, যিনি একাধারে লড়াই করেন হৃতসর্ব্বস্ব দুঃস্থের পক্ষ লইয়া এবং বেচারী শেফালী গাছটির পক্ষ লইয়া। প্রকৃতিদেবী তাঁহার সার্থক ওকালতীর পুরস্কার স্বরূপ যে সৌরভ ও মাধুর্য্য দান করিলেন তাহা চিরদিনের জন্য তাঁহার প্রাণের মণ্ডপে বাসা বাঁধিয়া রহিল। সেই সৌরভের আকর্ষণে

ভাব-মধুকরগণ অনবরত মধু অন্বেষণ করিয়া গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল অলিন্দে অলিন্দে, কবির শয়নকক্ষে এমন কি ভাণ্ডারগৃহেও—যেখানে কবি-গৃহিণী কর্ম্মনিরতা রহিয়াছেন।

পারিবারিক প্রেমের অপূর্ব্ব ছবি যেভাবে দেবেন্দ্রনাথের তুলিকায় জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। মা, ভাই, বোন, পত্নী ও সন্তান-সন্ততি শুধু ইহাদের নিয়াই তাঁহার পবিবার সম্পূর্ণ হয় নাই, সে পরিবারে চেনা ও অচেনা কত চিত্র ও কত চরিত্র। এমন কি 'বিধবার আর্শি' ও লক্ষ্মৌর আতা পর্য্যন্ত নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব লইয়া বিরাজ করিতেছে কবির সেই পারিবারিক চিত্রশালায়। অশোকতরু যদি জাতিস্মর হইত তাহা হইলে সে কোন্ দোলপূর্ণিমায় ফাগ মাখিয়া লালে লাল হইয়াছে অথবা কোন্ চিরসধবার ব্রত উদ্‌যাপনে সিঁদুব বরণ বাসন্তী শাড়ি উপঢৌকন পাইয়াছে কবিকে সে কাহিনী শুনাইত। কিন্তু সে ভুলে যাওয়া কাহিনী এখন আর তাহাব মনে নাই তাই ঘুমন্ত শিশুর 'দেয়ালা'র মত কেবল বাঙ্গা হাসি হাসিতেছে।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পারিবাবিক জীবনেব ছবি আঁকিয়াছেন কবিতার তুলিকে প্রীতিরসে ডুবাইয়া। সে ছবি কেবল ব্যক্তিগত পারিবারিক চিত্রই নয়, তাহার ভিতর বাঙ্গালীব ঘরের সমস্ত পাবিবারিক ভালবাসা তিনি যেন উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন।

> "পাঁচ ভাই তিন বোন ছিলাম আমরা
> সুবপুরে গেছে চলি দুইটি ভগিনী,
> একে তিন তিনে এক, তাই তুই এবে
> মানময়ী, মানি, মানা, মেনা, সরোজিনী।"

কবির নিজের সহোদরার প্রতি যেমন এই ভালবাসা আবার ঠিক সেই-রকম বহুদিন পরে অপর পরিবারের মেয়ে পিত্রালয়ে আসিয়াছে তাহার আনন্দেরও তিনি অংশী হইয়াছেন সমভাবে,

"পড়ে গেল হুলুস্থুল পাড়ার ভিতরে,
করিয়ে শ্বশুর ঘর বহু বহুদিন পর
এসেছে, এসেছে কন্যা নিজ পিতৃঘরে।
বহুক্ষণ মার কাছে, খানিক পিতার কাছে,
খোকারে পিঠেতে তুলি খানিক বাগানে,
খুকির ধরিয়া কর দেখে তার খেলাঘর,
দুটি কথা খানিক সইর কানে কানে।

ঝি-মারে বসায়ে দূরে, নিজে গৃহকাজ করে,
কভু কাটে ফলমূল মার কাছে বসে।
ছোট বৌর হাত হ'তে কাড়ি লয়ে আচম্বিতে,
নিজে কভু সাজে পান মনের হরষে।
বহু বহুদিন পরে কন্যা আসি পিতৃঘরে
মূর্ত্তিমান হাসি যেন ছুটিয়া বেড়ায়—
হায়রে, আমার চক্ষু জলে ভেসে যায়!

এই দৃশ্যে আনন্দে কবির চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। কবি নিজ জননীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

মা।

তবু ভরিলনা চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে, মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুখে;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া,
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি, ভৈরবে বেড়িয়া
করিলাম কত নৃত্য; প্রফুল্ল আশ্রমে

রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে, পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জামালা।
তবু ভরিলনা চিত্ত। সর্ব্বতীর্থ সার
তাই মা, তোমার পাশে এসেছি আবার।

আবার, "একি ইচ্ছা! ঘাটে যায় অচেনা রমণী
ওরে কেন সাধ যায় বলিতে "জননী?"
ঘোমটা টানি মাথায়, কুলবধূ চলে যায়,
ঝু'করে কঙ্কণ বাজে, চরণে শিঞ্জিনী—
ওরে কেন সাধ যায় বলিতে জননী।

তাঁহার শিশুকন্যা রানী ও রানীর ঠাকুরমার চিত্র,—

রানীর জোড় হাত।

"আমার মায়ের চক্ষে এক কোণে হাসি রাশি,
আর কোণে নয়নের লোর,
আমারে কহেন ডাকি ঘোর কলি উপস্থিত
মেয়ের আক্কেল স্থাখ তোর।
"ঠাকুরমা, ঠাকুরমা" বলে পয়সা নেয় কত ছলে
চুমা খায় জড়াইয়া গলা,
দাসীরে ডাকিয়া আনি সন্দেশ আনায়ে ওই
খায় স্থাখ একেলা একেলা।"

রানীর স্পর্দ্ধা।

তিন বছরের মেয়ে উমাশশী নাম তার
'রানী' তার আদরের নাম,—
এমনি আস্পদ্ধা তার ঠাকুরমারে করে সে গো
পদে পদে শত অপমান।

"উঠানে খেলিতেছিল রানী ছিল এইখানে,
দেখ্ দেখ্ রানী গেল কোথা ?"
পড়ে গেল হুলুস্থুল, 'কোথা গেল, কোথা গেল'
'খোঁজ্ খোঁজ্ রানী গেল কোথা !'
ঠাকুরমার সর্ব্ব অঙ্গ কেঁপে উঠে থর থর,
কাকাবা খুঁজিয়া হ'ল সারা !
কুয়ায় ডুবিল নাকি ? ধরিয়ে কি লয়ে গেল
লক্ষৌর ক্রূর ছেলেধরা ?
কতক্ষণে ক্রোড়ে করে, ফণিমামা নিয়ে এল
গৃহস্থের হারাণো রতন !
কুস্বপন ভেঙ্গে গেল, আবার নিশ্বাস ছাড়ি
সবে মোরা মুছিনু নয়ন !

করিয়ে বিদ্রূপ সবে তোমরা হেসনা হাসি,
গরীবের নীরস কথায়,
মরে যায়, ডুবে যায়, প্রাণে সব সহ্য হয় !
ছেলে-হারা সওয়া নাহি যায় !

রানীর ঠাকুমা তবে দাসীরে ডাকিয়ে কন
'এই বুঝি রানীরে খেলাস্ ?
আজ যদি মেয়ে মোর হারাইয়ে যেত বাঁদি
গলায় পড়িত তোর ফাঁশ !
এই নে মাহিনা তোর' এত বলি গৃহকর্ত্রী
দাসীরে দিলেন তাড়াইয়া !

সদিয়ার মাতা হায়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়
রানী উচ্চে—উঠিল কাঁদিয়া।

আকুল করুণ ডাকে, 'দাই, দাই' বলে হাঁকে
ঠাকুরমাতা হইলা অস্থির ;
কি জানি কি ভেবে চিত্তে দাসীরে ডাকিয়া নিলা
রানী উঠে ক্রোড়েতে দাসীর !
দুই বছরের মেয়ে উমাশশী নাম তার
রানী তার আদরের নাম,
এমনি আস্পর্দ্ধা তার, ঠাকুরমারে করে সে যে
পদে পদে শত অপমান !

'রানীর জোড়হাত' কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, এই কবিতায় শেষের দিকটির ভাব এই যে, ঠাকুরমা যখন বলিলেন, রানী আমাকে একটু সন্দেশ দাও তো ঃ

"রানী কিন্তু আধখানা আপনার মুখে দিল পুরি,
আর আধখানা লয়ে গলাটি জড়ায়ে মোর
মোরে রানী দিল খাওয়াইয়ে,
মা মোর কহেন হাসি 'ঘোর কলি উপস্থিত,
বাপেরে চিনিল দেখ মেয়ে'।"

ঠাকুরমা যখন রানীকে শাসন করিতেছেন তখন রানী তাহার ছোট ছোট হাত দু'খানি জোড় করিয়া ঠাকুরমার দিকে চাহিয়া আধ আধ ভাষায় উচ্চারণ করিল, "ঝুটা, পাঁও রোটি" অর্থাৎ সন্দেশটি রানী 'ঝুটা' করিয়া ফেলিয়াছে, ঠাকুরমা 'ঝুটা' ও পাঁওরুটি খান না তাহা রানী জানে। এই কবিতার শেষ দিকের ছত্র—

"একপাশে ছিল বসি, রানীর জননী তথা
বধূ মোর হেমন্তকুমারী।"

কবি এই সুযোগে দ্বিধামাত্র না করিয়া পাঠকগণকে তাঁহার বধূর নামটিও শুনাইয়া দিলেন।

এই বধূ, ইনিই কবির কাব্যনির্ঝরিনী স্বরূপা। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যত কবিতা ঝঙ্কৃত হইয়াছে তাহার মাধুর্য্য পাঠকের মন অনায়াসে হরণ করিয়া লয়। কবির যখন বিবাহ হয়, কবিপত্নী তখন বালিকামাত্র; পরিজন সকলেই বালিকা বধূর রূপের প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কবি বলিতেছেন, তিনি বধূর বাহিরের রূপ দেখিয়াই মুগ্ধ হন নাই—

"আমি হেরি বালিকার সবল হৃদয়,
সর্ব্বংসহা, মৌনী ধরা সম সহিষ্ণুতা,
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হয়ে বয়
পরদুঃখে, নারীরূপা এ কোন্ দেবতা?"

*　　　*　　　*

একি কাব্য সারারাত্রি জ্বলিছে দেউটি,
প্রিয়া-চক্ষে কাব্য পড়ি উলটি পালটি।

রজনীতে প্রিয়া যখন পতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার এক অপূর্ব্ব রূপ:

"কি উৎসব! হাসে দীপ, হাসে নেত্রভাষা,
হাসে অলকের পুষ্প, ঝলকে ঝলকে
হাসে তব রক্ত চেলী; হর্ষে হয় সারা
সারা গৃহ গৌরাঙ্গীর পরশ পুলকে।
রূপে ভোর পতি তব, তোমার সুষমা
পান করে শত নেত্রে অয়ি মনোরমা!

আবার প্রত্যূষে:

"নিশান্তে, করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটী
এলাইয়া তরঙ্গিত আর্দ্র কেশরাশি
শ্বশ্রূর পূজার কক্ষে পশি হাসি হাসি
সাজাও পুষ্পের থালা চন্দনের বাটী।"

যখন,

পরি এক আটপৌরে শাড়ি, হে সুন্দরি
কোথা যাও ? বিম্বাধরে আনন্দ না ধরে,
পশিয়া রন্ধনগৃহে অন্ন ও ব্যঞ্জন
সুস্বাদু ! বাঁধি , যতনে পরিবেশন
করিছ দেবরবর্গে কতই আদরে।

তখন কবি সেই কল্যাণময়ী গৃহস্থ বধূর রূপে মুগ্ধ হইয়া ভাবেন

শব্দ-ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা,
তুমি সখী অর্থময়ী ভাবময়ী গীতা।

তুমি মোর স্পর্শমণি ! তোমার দু'হাতে
পিত্তলের বালা যদি পরাই সোহাগে
পবিত্র-কঙ্কন দুটি, জ্যোৎস্না-সম্পাতে
ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে।

প্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাব তরঙ্গ উঠিয়া কবিচিত্তকে প্লাবিত করিয়াছে। তাঁহার 'প্রিয়তমার প্রতি' 'প্রথম চুম্বন' 'সাঁঝের প্রদীপ' 'আমি' 'খোঁপা খোলা' 'নিরলঙ্কারা' 'ঘোমটা খোলা' 'লাজ ভাঙানো' 'তিল' 'মৃদু হাস্য' 'উচ্চহাসি' 'ভেঙনা, ভেঙনা মান' ও 'মহীরাবণের পালা' প্রভৃতি বহু কবিতার নায়িকা তাঁহার গৃহলক্ষ্মী।

কবির গৃহিণী একাধারে পত্নী ও প্রণয়িনী। প্রণয় ব্যাপার গৃহজগতে চলে না এ ধারণা যাঁহাদের আছে কবির প্রেম-কবিতা পাঠ করিলে তাঁহাদের সে ভুল ধারণা অন্তর্হিত হইবে।

'মহীরাবণের পালায়' কবি বলিয়াছেন, "মদনের পুত্র প্রেম নানা মায়া-রূপে আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কখনও সুন্দরী

রূপসী হইয়া, কখনও বা বধূরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া দুর্গের সজাগ প্রহরীর কাছে ধরা পড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে :

"ছেলে কাঁখে করি শেষে আইল জননী,
একি মায়া। চিত্ত চুরি হইল অমনি।"

অর্থাৎ তাঁহার প্রিয়াকে তিনি কেবল প্রিয়ারূপে পাইয়াই পরিতৃপ্ত নহেন, সন্তানের জননী রূপে সেই প্রিয়তমা তাঁহাব অধিকতব চিত্তহাবিণী। 'সোহাগিনী ইথে তোর কেন অভিমান' এই কবিতায় সেই ভাবটিই সুস্পষ্ট হইয়াছে।

"সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান ?
ছ' মাসেব শিশুটিবে,
বুকে ক'বে ধীবে ধীবে
আমাব কোলেতে দিতে হ'লি আগুয়ান ,
আমি কহিলাম তোবে,
'থাকুক তুহাবি ক্রোড়ে'—
তুই কেন হ'লি তায় আকুল নয়ান ?

*

ফুল শিশু আঁখি খুলে,
তরু শাখে দুলে দুলে,
দেখে যবে মুগ্ধ মুখে উষার বয়ান,
ভুবন ফিবাতে নারে আপন নয়ান।
তরু কোল শূন্য কবি
সে তরু-দুলালে হবি
আমি কি আনিতে পাবি থাকিতে এ প্রাণ ?
সোহাগিনী, ইথে তোব এত অভিমান ?"

যৌবনে প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন;

'দাও, দাও, একটি চুম্বন—
তোমাব ও ওষ্ঠ দুটি বাসন্তী যামিনী জাগি,
পাতিয়াছে ফুলশয্যা বল গো কাহাব লাগি?

* * * *

পুষ্পময়, স্বপ্নময়, তোমার ও ভালবাসা,
কবিতা-বহস্যময় নীবব তাহাব ভাষা
তোমাব ও মদিব চুম্বন,
কপোত কপোতী সনে
মগ্ন মৃদু কুহরণে
থাকে যথা, সেইরূপ পবামর্শ কবি,
তব ওষ্ঠ মম ওষ্ঠে উঠুক্ কুহবি?"

আবাব পবিণত বয়সে সেই প্রিয়াকেই তিনি বলিতেছেন,

"এ জীবনে এ সমস্যা পুবিল না মোব,
যুবতী কি প্রৌঢ়া তুই? হাবে চিত্তচোব?"

"ভেঙনা ভেঙনা মান" কবিতায়,—

"ভেঙনা, ভেঙনা মান, কব ধবি তাব,
বন্দী কবি বেথ ধবি কবে আপনাব।

* * *

"ভেঙনা, ভেঙনা মান, সেধনা হেলায়,—
মানিনীব কি মহিমা কে বুঝে ধবায়?
চপল চক্ষুর বঙ্গে অভিবাম গ্রীবাভঙ্গে
কুটিল অপাঙ্গে তাব, শিথিল ব্রীড়ায়
কি যে আমি শিখিয়াছি, বুঝানো কি যায়?"

'খোঁপা খোলা' কবিতায়,—

"খোঁপাটি দিয়েছে খুলে ; এই দোষ ওর ?
খোকাবে বোলনা কিছু এ মিনতি মোব।
দেখ সখি, চুলগুলি
শ্রীঅঙ্গে পড়েছে ঝুলি,
দোলায়ে অলকাবলি খেলে বায়ু চোব !
ভূমিতে লুটায় আসি
কেশেব ঐশ্বর্য্য বাশি,
শিহরি মেদিনী হয় পুলকে বিভোব !
সোহাগিনী শোভাব যে নাহি আজি ওব !" ***

'নিরলঙ্কাবা' কবিতায় ঃ

* * *

"কষিত কাঞ্চন জিনি,
তোর ও তনুয়া খানি !
তাহে কেন অলঙ্কাব দিবিরে চাপায়ে ?
আহা ও মুবীর পুচ্ছে,
আহা ও ফুলের গুচ্ছে,
কাজ নাই, কাজ নাই অলক্ত মাখায়ে !

নাহি শবদের ছটা,
নাহি উপমার ঘটা
তবু চিত্ত গীতিকাব্যে ফেলেছি হারায়ে।
আজি শূন্য দেহে থাক,
আমার মিনতি রাখ ;
চির তৃষিতের তৃষা দাওগো মিটায়ে। ***

'আলতা মোছা কবিতায়' :

অলক্তাক্ত দু'চরণে জল দিল ঢালি,
ধুয়ে' গেল, মুছে গেল, পাড় কেন গালি ;
খোকার নহে গো দোষ,
ওব প্রতি মিছে রোষ,
ও শুধু জলেব ঘটি ক'বে এল খালি।
কানেতে শিখায়ে দিনু
ঘটিটি ধবায়ে দিনু
ও শুধু জলেব ঘটি ক'রে এল খালি !
দূতেব কি দোষ কভু
ন্যায় যুদ্ধে তাবে প্রভু
পাঠায় আপন কাজে, ভুলিলে কি আলি ?* * *

এই ভাবে চাবিচুরি কবিয়া প্রিয়াকে গহনা পবিতে না দিয়া,খোকাকে শিখাইয়া আলতা ধোয়ান, খোঁপা খোলান প্রভৃতি ব্যাপাবে কবির পবম-আনন্দ।

প্রিয়াব বর্ণনা কবিতে গিয়া কবি ভাষা খুঁজিয়া পান না। কত লোক কত ভাবে নিজ নিজ প্রিয়াব বর্ণনা করে। কেহ বলে, আমাব প্রিয়ার মুখখানি যেন পূর্ণচন্দ্রের মত, আবাব কেহ বলে, প্রিয়ার মুখখানি যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম, কেহ বলে প্রিয়া যেন উষার মত উজ্জ্বলবর্ণা ; কবি বলিতেছেন :

সাদাসিধে লোক আমি, উপমার ঘটা
নাহি জানি , নাহি জানি বর্ণনাব ছটা।
যদি কিছু থাকে মোব কবিত্ব-বড়াই,
অবাক্—ও মুখ হেবে,—সব ভুলে যাই ,
এই দুটি কথা আমি বুঝিয়াছি সাব—
'চুম্বন-আস্পদ' মুখ প্রিয়ার আমার !"

প্রিয়তমাব প্রতি।

"নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,—
আধ গ্ল্যাস জল যেন নিদাঘের কালে !

সান্নিধ্যে গুরুজন ; চল অন্তরালে ;
দোঁহার হিয়ায় মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে !

কে যেন গো কানে কানে কহিছে সোহাগে—
"আন থালা, ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়,
এক রাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায় ?

শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে !
বন্দী হ'য়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে
কাঁদে যথা সুকবিতা গুমরে গুমরে
মনোদুঃখে, ঘোমটার জলদ-আঁধারে—
তোমার ও মুখশশী কাঁদিছে কাতরে,
ছাদে চল , মুক্ত বায়ু অদূরে তটিনী ,
দ্রৌপদীর শাড়ি সম সচন্দ্রা যামিনী ।

সাঁঝের প্রদীপ ।

নেত্রে হাসি, হস্তে দীপ এস গো রূপসী
হ'ল মোর শয্যালয়, কুমুদ কহ্লার ময়,
ছেয়ে গেল নিশিপদ্মে চিত্তের সরসী !
হের দেখ, হাসি হাসি দিল মোর কাছে আসি
এক রাশি ফোটা ফুল কল্পনা রূপসী ;
আঁধার পাইল ভয়, পুণ্যের হইল জয়
হেরি সখি নিশি মুখে তব মুখশশী !

২

গৃহ রাজত্বের চির-বিজয়ী অধীপ !
অসাধ্য হইল সাধ্য, পুরুষ হইল বাধ্য,
জয়, জয় নারী তব সাঁঝের প্রদীপ ।

৩

মধুনিশি জ্যোৎস্নালোক,　　　লালে লাল ফুটাশোক,

কি কাহিনী কানে তব কহিলা মোহিনী ?

তাই ও ভালের টিপ,　　　তাই ও সাঁঝের দীপ,

আভাষে প্রকাশ করে অশোক-কাহিনী।

তুমি কি নিজের আঁখে　　　পরীদের ক্ষুদ্র কাঁখে

হেরিয়াছ কুঞ্জবনে জোনাকী গাগরী ?

হেরি তোমা হর্ষে সারা　　　নিশান্তে কি শুক্রতারা

ঢালি দিল প্রাণে তব আলোক লহরী ?

৪

নিশি ভোর হয়, হয়　　　তুমি সখি সে সময়

আলোকে দাঁড়িয়েছিলে, করে ফুল সাজি ?

'শিবের পূজার তরে,　　　শ্রদ্ধা ভরে, হর্ষ ভরে,

বাছি বাছি তুলে নিলে ফুল্ল ফুলরাজি।

হেরি ও ধরণ ধারা,　　　জ্যোৎস্না হাসিয়া সারা

লুটায় চরণে তব শেফালী ছায়ায়।

চাঁদ ডাকে 'আয় আয়'　　　জ্যোৎস্না কি সেথায় যায়,

ঝাঁপাইয়া ক্রোড়ে তব পশিল হিয়ায়।

৫

"সহসা কৌস্তুভমণি হাসিল হরষে !

সহসা ফুটিল পদ্ম মানস-সরসে !

সহসা উপমা আসি,　　　জ্যোতিশ্ছটা পরকাশি

বরষিল ভাবরাশি কবির মানসে।

লাবণ্য উথলে দেহে　　　ইন্দিরা পশিলা গেহে

হাসিয়া উঠিল গেহ চরণ-পরশে।"

রবীন্দ্রনাথ কবির এই সকল কবিতা শুনিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০৮ সালে স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন এলাহাবাদ হইতে 'প্রবাসী' প্রচার করেন তখন দেবেন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে নিজেব বচিত বহু কবিতা ও রসরচনা দিয়া ছিলেন। প্রথম বর্ষেব 'প্রবাসী'তে 'কমলাকান্ত শর্ম্মা' নামে সেই রস রচনা বাহিব হয়। সেই সময় ববীন্দ্রনাথ তাঁহাব সম্পাদনায় যে নব পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে নব-প্রকাশিত 'প্রবাসী' পত্রিকাব সমালোচনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথেব বিষয়ে যে ভাবে উল্লেখ কবিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত কবিতেছি :

"আমাদেব প্রবাসী কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনেব প্রেমাশ্রুজলে ইহাব (অর্থাৎ প্রবাসী পত্রিকাব) অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীও ধন্য, প্রবাসী বাঙ্গালীর কবিও ধন্য। স্বর্গীয় কমলাকান্ত শর্ম্মা লোকান্তব হইতে ইহলোকে এবং বঙ্গের 'বঙ্গদর্শন' হইতে প্রবাসে গেলেন, এ ইন্দ্রজাল কে ঘটাইল? মায়াবী তাঁহাব নাম গোপন কবিয়া ফাঁকি দিতে পাবিবেন না—কবিব লেখনী ছাড়া এ যাদু আব কোথায়? যে কবি অশোক-মঞ্জবী হইতে তাহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণ ঝঙ্কাব হইতে তাহাব বহস্য কথাটি চুবি করিয়া লইতে পারেন, তিনি যে বাতাবাতি 'বঙ্গদর্শন' হইতে তাহাব 'কমলাকান্ত'টিকে হরণ করিয়া প্রবাসে পালাইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু চোরকে যদি আমাদের 'বঙ্গদর্শনে' বাঁধিতে পাবি তবেই তাহাব উপযুক্ত শাস্তি হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ বধূর ভূষণ ঝঙ্কাবেব উল্লেখ কবিয়াছেন। সেই ভূষণ ঝঙ্কারেব বহস্যমূলক কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

ডায়মন কাটা মল।

[সেদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়াছি। রাঙাদিদির সহিত গল্প কবিতেছি ; এমন সময়ে নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়িব তিন বধূ ও বাড়িব কন্যা (আমার গৃহলক্ষ্মী) ঝমর্ ঝমর্ ঝমাৎ শব্দে প্রত্যাগত হইলেন। রাঙাদিদির আদেশ হইল, 'নাতজামাই, বুঝিব তুমি কেমন কবি। মলের শব্দে ঠাওরাও দেখি কোন্‌টি কে?' তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।]

১

"ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্ বাজে ওই মল।
উঠিছে পড়িছে কিরে, নামিছে উঠিছে কি রে
রূপ-হর্ম্মে সঞ্চারিণী রাগিণী তবল ?
ভ্রমব কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিশুতিব শান্ত গৃহে খুলিয়া অর্গল ?
সুন্দবীর উচ্চহাসি, পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
অবিবল ছুটে কি বে আনন্দে চঞ্চল ?
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্ ঝমর ঝমাৎ ঝম্
কেন আজি প্রতিধ্বনি হবষে বিহ্বল ?

মল বলে, 'আমি যাব বধূ সে গো নহে আব,
মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল।'
বড় বধূ ওই আসে শিশুরা পলায় ত্রাসে,
চঞ্চল-চবণা দাসী সহসা নিশ্চল !
ভ্রমব কি গুঞ্জবিছে ? কোকিল কি ঝঙ্কাবিছে ?
মুখব বিবহ বলে 'চল্ চল্ চল্'—
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্ ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্ বাজে ওই মল।

২

ঝমর্ ঝমর্ ঝম্ বাজে ওই মল।
হ'ল না বে ঘুবাইতে, প্রেম চাবি ছুঁতে ছুঁতে
না ছুঁইতে বাজে কেন সোহাগেব কল ?
ঝিল্লি সাথে নিশি বায় ঝাঁপতালে গীত গায়,
নিশি মুখে ফুটে ওঠে গোলাপেব দল।
রাজহংস দূত এল প্রাণ কর্ণে কি কহিল,
লজ্জা গেল, দয়মন্তী তনু টলমল।

ঝমর্ ঝমর্ ঝম্,   ঝমর্ ঝমর্ ঝম্
তেমতি বধূর পায়ে বাজে ওই মল।
মল বলে,—'আমি যার,   বধূ সে গো নহে আর,
ভগ্নীভাবে ভয় লজ্জা ভুলেছে সকল।
খোকার ঝিনুক কই?   মেজ বৌ বলে ওই,
অধরে গরল তাব নয়নে অনল
কুহু কুহু কুহরিত   অলিপুঞ্জ মুখরিত
বধূব যৌবন-কুঞ্জ মরি কি শ্যামল?
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্ বাজে ওই মল?

৩

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুমুব ঝুমুব ঝুমু, বাজে ওই মল!
পদ্মদলে পরবেশি,   হাবাইয়া দশদিশি
ভ্রমবা গুঞ্জবে কি বে হইয়া পাগল?
অতনু কি মৃদুভাষে,   লুকায় উমার বাসে?
পাছে ভাঙ্গে তপ, জ্বলে হর-কোপানল!
কেন, কেন ম্রিয়মান,   হেমন্তে পাখীব প্রাণ?
বসন্তের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল?
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম ঝুমুব ঝুমুব ঝুমু, বাজে ওই মল
মল বলে, 'আমি যাব,   চিব-লজ্জা সখী তাব,
ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ-হলাহল?
চুম্বিয়ে চবণ তার   জাগাই গো বার বাব,
বধূব কেমন পণ সকলি বিফল!"
ঘোমটা টানি মাথায়   সেজো বউ চলি যায়,
পদ্মদলে বদ্ধ অলি হয়েছে বিকল!
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু, বাজে ওই মল।

রুনু রুনু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুনু রুনু ঝুম বাজে ওই মল ?
জল পড়ে ঝর ঝর, ত তনু থর থর,
ভাঙ্গা-গলা কো'কিলার সঙ্গীত তরল ?
শুনে শ্যাম নাহি এল, কঙ্কন খসিয়া গেল,
আঁখি চাহে ধরাতল।
মিলন-লজ্জার বুকে মুখ গুঁজে অধোমুখে,
কহে ধীরে 'হেথা হতে চল্ সখী চল্।'
প্রগল্ভা হাসিতে চায়, গুরুজন ! একি দায় !
চঞ্চল-মুখর ওষ্ঠে ঝাঁপিল অঞ্চল ,
রুনু রুনু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুনু রুনু ঝুম্
মল বলে, 'বল্ ওরে সবে যেতে বল্ ;'
কবি বলে, আসে ওই, আমার আনন্দময়ী,
সরমে শিথিল তনু ভরমে বিকল ;
যামিনীতে দেখা হ'লে শুধাবো সোহাগ ছলে,
'তরল-জ্যোৎস্না-জলে ধু'য়ে ধরাতল,
শারদীয়া শর্ব্বরী সখি, তোর গলা ধরি,
এমনি কি গান গায় ? বল সখি বল।
রুনু রুনু ঝুম্ ঝুম রুম্ রুনু রুনু ঝুম্
ওই বাজে মল।"

দেবেন্দ্রনাথের রচনায় শিশুদিগের সম্বন্ধেও নানা ভাবে ভাবোচ্ছাস দেখা যায়। অচেনা শিশুকে দেখিলেও তাহাকে কোলে নিয়া চুমা খাইবার জন্য তাঁহার মনে আকুলতা আসে, কিন্তু তিনি ভাবেন, কাজ নাই, আত্মীয়ের কোলে উঠিয়া শিশুটি খুবই আনন্দে আছে, অনাত্মীয় কাহাকেও দেখিলে ও ভয়ে চোখ বুজিতেছে, আমি কোলে নিলে হয়ত কাঁদিয়া উঠিবে। কিন্তু কবি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে শিশু ঝাঁপাইয়া তাঁহার কোলে আসিল, যেন :

জাতিস্মর হল শিশু ক্ষণেকের তরে!
আমারে দেখেছে যেন জনম অন্তরে!"

কবি শিশুর দিকে চাহিয়া বিভোর হইয়া যান, ভাবেন,

"জনমে জনমে আহা,
বুঝিতে নারিনু যাহা
সে রহস্য শিশু যেন বুঝেছে সকলি।

* * *

মায়ের বদন হেরি
স্বরগের কথা স্মরি
পুলকে নাচিয়া উঠে আঁখি সুকুমার,
হায়রে আমার চক্ষে বহিছে আসার।"

কবি হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান, কিন্তু শিশুর বেলায় জাতিভেদ স্বীকার করেন না, বলেন:

"ওরা সবাই ঢালা এক ছাঁচে
ওরে, ছেলেদের কি জাত আছে?"

তাঁহার নিজের খোকা-খুকীকে লইয়া তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, সেগুলি অতি সরল অনাবিল স্নেহরসে অভিষিক্ত। মেয়ে জন্মগ্রহণ করিলে শাঁখ বাজান হয় না ইহা কবি সহ্য করিতে পারেন নাই, তাই 'দুহিতা মঙ্গল শঙ্খ' নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন।

১২৯৭ সালে ফাল্গুনের 'ভারতী'তে কবি 'বিজয়া' নামে একটি কবিতা লেখেন, এই কবিতার উপরের গৌরচন্দ্রিকা সমেত কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

বিজয়া।

[আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই কাহিনী। বি. এ. পাশ করা পুত্রের পিতা a pound of flesh-এর জন্য লালায়িত। আর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা

সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পৌরাণিক শ্যেন কপোতের ন্যায় বিনা দ্বিরুক্তিতে বক্ষ পাতিয়া দেন। আমার অনুরোধ এই যে, সর্ব্বস্বান্ত পিতা কন্যার ঘর-বসতের সময়ে যেন এই কবিতাটি কন্যাকে সম্বোধন করিয়া পাঠ করেন।]

'সপ্তমীতে সাজাইনু, আপাদ মস্তক তোর
মোর গৃহে ধূম হইল ভারি।
মোর বেয়াইর কবে, ঘর বাড়ি দিয়ে বলি
অষ্টমীতে হইনু ভিখারী।
নবমীতে সর্ব্বস্বান্ত, তবুও সুখের অন্ত
নাহি মোর ও মুখ নেহারি;
সাক্ষাৎ মা ভগবতী তোর ওই দৃষ্টি সুধা
পান করি, যন্ত্রণা বিসারি।
উৎসব ফুরায়ে গেছে, বিজয়া যে আসিয়াছে,
ঘাটে ওই নৌকা সারি সারি।
মাগো তুই চলে যাবি? ধনে প্রাণে মজে' মাগো
আজ আমি যথার্থ ভিখারী।"

ছোট ছেলে মেয়ে বিশেষতঃ মেয়েদের উপর দেবী ভাব আরোপ করিয়া তিনি অনেক কবিতা লেখেন। এগুলি প্রায়ই তাঁহার শেষ বয়সের রচনা, অর্থাৎ ১৯১০-১৯১১ সালের রচনা। তাঁহার 'অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল কাব্য' ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৪৫টি কবিতা আছে।

'অপূর্ব্ব' শব্দটি কবি বহুস্থানে ব্যবহার করিয়াছেন এবং গোলাপগুচ্ছ গ্রন্থের 'নিবেদনে' তাহার একটা কৈফিয়তও এইভাবে দিয়াছেন 'প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল' 'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য' প্রভৃতি অপূর্ব্ব হইল কি প্রকারে? ইহার উত্তরে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি—এই কবিতার অধিকাংশই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে, সেইজন্যই তাহারা অপূর্ব্ব। বড়লোকের বাড়ির ঝি চাকরও বড়মানুষ।"

কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁহার দৃষ্টিই অপূর্ব্ব, তাই তাঁহার দৃষ্টিতে

এই দৃশ্যমান সৃষ্টির যাহা কিছু সে সমস্তই ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন, তিনি সঙ্কল্প পত্রিকায় ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণে 'মনীষামন্দিরে' নামক প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯১১ সালে অধ্যাপক মহাশয় পূজার ছুটিতে যখন জব্বলপুর বেড়াইতে যান তখন দেবেন্দ্রনাথ সপরিবারে সেখানে ছিলেন। সেইসময় দেবেন্দ্রনাথ আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছি। সেই সকল কবিতাতে মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিকতা আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ নারীজাতিকে আমি জগন্মাতার অংশরূপিনী,—ভগবানের সৌন্দর্য্য বিকাশ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না। আমার শিশু সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিও এই sense-এ ব্যক্তিগত হইয়াও সার্ব্বজনীন। এখানেও আমি শিশু চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্নভাবে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।'

'গোলাপগুচ্ছ' কবিতা গ্রন্থখানি কবি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ :

"যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ঊষার আলোকবন্যার মত
চিত্তহারিণী,
যাঁহার বাসন্তী কবিতা গোলাপ ফুলের মত
সৌরভ ও গৌরবময়ী,
যিনি শ্রী হরির মোক্ষ-মন্দিরের পথে অপূর্ব্ব যাত্রী,
স্বয়ং ভক্তিদেবী যাঁহার পথ-প্রদর্শিকা,
সেই সাহিত্য-সম্রাট, বন্ধুশ্রেষ্ঠ
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর কমলে
এই কবিতাগুলি
সাদরে অর্পিত হইল।

রবীন্দ্রনাথও 'সোনার তরী' গ্রন্থখানি দেবেন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন :

"কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
মহাশয়ের করকমলে
তদীয় ভক্তের এই
প্রীতি উপহার
সাদরে সমর্পিত
হইল।"

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'অশোকগুচ্ছ' গ্রন্থখানি স্বর্ণকুমারী দেবীকে উপহার দিয়াছেন :

পূজনীয়া,
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী
সম্প্র-কমলাসু

"যুগে যুগে জন্মে জন্মে
নবোৎসাহে দেবেন্দ্রবন্দিতা,
ধর দেবী অর্ঘ্যপুষ্প
দাসের এ সাধের কবিতা।"

কবির 'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য' গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'শ্রীহরির প্রতি'। ইহার পর প্রায় সকল কবিতাই কাহারও না কাহারও উদ্দেশ্যে রচিত, যেমন 'শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি', 'মা', 'সাবিত্রী', 'কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব পালিত মহাশয়কে উপহার'। 'মোহিনী দেবীর স্মৃতি কবিতা পাঠ করিয়া' 'অশ্রুকণা' পাঠান্তে 'সধবা', 'বিধবা' 'শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিণী দাসীর উদ্দেশে' ইত্যাদি।

'কবি করুণা নিধান', 'ভক্তবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত', 'কবি ভ্রাতা চিত্তরঞ্জন দাস', 'কবিভগ্নী সরোজকুমারী দেবী', 'কবিবর রবীন্দ্রনাথ', 'কবি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'কবি কালিদাস রায়' প্রভৃতি এবং রাজা রামমোহন রায়, মাধোদাসজী ইহাদের সকলের প্রতিই শ্রদ্ধার সহিত এই নৈবেদ্য নিবেদন করা হইয়াছে।

শুধু ব্যক্তিগত ভাবেই যে এই নৈবেদ্য-নিবেদন তাহা নয়, অক্ষয়কুমার বড়াল, কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচি প্রভৃতি কবির রচিত কবিতাকেও এই অপূর্ব্ব নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হইয়াছে। কাহারও কবিতা 'অপূর্ব্ব কবিতা রূপসী' কোনটি বা 'অপূর্ব্ব কবিতা সুন্দরী' আবার কোনটি 'অপূর্ব্ব কবিতা রানী'। কবি বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রকেও সম্বোধন করিয়া দুটি সনেট নিবেদন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া 'সরোজবাসিনী', 'সোনার মেয়ে', 'রাঙামেয়ে', 'টুকটুকে মেয়ে' প্রভৃতি কবিতায় কতকগুলি শিশু বা বালিকা কন্যাকেও কবিতার অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল কন্যা কবির দৃষ্টিতে জগন্মাতার প্রতীক-স্বরূপা। যেমন,—

অপূর্ব্ব রাঙামেয়ে।

রাঙামেয়ে, রাঙামেয়ে, রাঙামেয়ে মোর !
কাড়িয়া লয়েছ বাছা নয়নের ঘুম !
বদনে না পাই ভোর সুষমার ওর,
চরণে কি বাজে ওই রুনু ঝুনু রুম্।

*　　*　　*　　*

ঝিনুকের দাগে দাগে অরুণের রাগে—
রাঙামেয়ে, ওই তোর রাঙামুখ জাগে,
তমসুজ কালিমা দেখি তাহারও ভিতর
লালে লাল রাঙামেয়ে হাসিছ সুন্দর !

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কবি যে দীর্ঘ কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহার প্রথম শ্লোকটি এইরূপ ;—

"প্রতপ্ত-কনকোজ্জ্বলা এ কী কান্তি ! অতুল, অতুল—
হে সুন্দরী, ও রূপের ভাতি !
শত চন্দ্র বিভাসিত, পরি তারা-খচিত দুকূল,
যেন কোন পৌর্ণমাসী রাতি ;

কভু নববধূ সাজে   হাসিয়া মধুর লাজে

দেখা দাও ঘর আলো করি,

কভু নটী, সুচরিতে, তবু তুমি সতীকুলেশ্বরী।"

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবিতায়:

"পূর্ব্বকালে যথা অযুত তরঙ্গে
কল্লোলে হিল্লোলে লীলা রঙ্গ ভঙ্গে
ত্রিদিব হইতে ভগীরথ সঙ্গে
এসেছিলা মন্দাকিনী—
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে
নব মন্দাকিনী অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে
চলেছে সাগরে কি লীলা গতিতে
কল কল প্রবাহিণী।"

(রবীন্দ্রনাথের প্রতি ৬১ পৃঃ) অপূর্ব্ব নৈবেদ্য

* * * *

হে বরেণ্য মহাকবি!   হের মুগ্ধ সারা বঙ্গ আজি

রচিয়াছে স্বর্ণ-সিংহাসন!

বাজিছে মঙ্গল শঙ্খ   সাজাইয়া অর্ঘ্যপুষ্প রাজি

চারিধারে পূজা-আয়োজন!

চারিধারে হুলুধ্বনি,   আনন্দের রণরণি,

রাজ-অভিষেক-বাদ্য বাজিতেছে হৃদয় তোরণে,

বোস, বোস, রাজেশ্বর, এ ভক্তের প্রাণ-সিংহাসনে।

(রবীন্দ্রমঙ্গল, অপূর্ব্ব নৈবেদ্য) ৬০ পৃঃ

'ভারতী' স্বর্ণকুমারী দেবীর উদ্দেশে :

বসন্ত-পঞ্চমী নিশি, দেখিনু স্বপন
কি অদ্ভুত ! বসিয়াছে বীরাঙ্গনা মেলা !
খনার অলকগুচ্ছে তারকার মালা
দুলিছে ! পরিয়া মরি অঙ্গুরী রতন
হাসিছে পোর্সিয়া, রঙ্গে নাচিছে নয়ন !
বামা এক (জ্যোতির্ম্ময় স্থির আঁখিতারা)
আঁকিছে রমলা মূর্ত্তি হয়ে আত্মহারা
হেরিছে অবাক হয়ে মুখর ভুবন !
অন্য বামা 'করিনেরে' করিছে চুম্বন
ক্রোড়ে লয়ে, স্নেহময়ী জননী মুরতি !
কোনো বামা বীণাকণ্ঠে করে গুঞ্জরণ
অকালে মুঞ্জরী ওঠে বসন্ত ব্রততী !
সব মূর্ত্তি হ'ল এক, মধুর আকৃতি,
একি ! একি ! শিয়রেতে বঙ্গের ভারতী !

নব তপস্বিনী।

(আমি দেখিতে পাই, বালিকা কবি শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ও শ্রীমতী প্রমীলা বসু উদাস ও খেদোক্তিময় কবিতা লিখিয়া থাকেন, পাঠ করিলে চিত্তে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হয়। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল।)

"নিবাও, নিবাও শীঘ্র ! এত কি আমোদ !
জালিছ সাঁঝের দীপ হ'য়ে কুতূহলী ?
দেখিছ না ? এখনো যে একছাদ রোদ !
উচিত এ উদ্বোধন আইলে গোধূলী।
দুপুরে কি বাজে সখী ঝিল্লির নূপুর ?

তুমি কি ভেবেছ ওই বৈকালী যুথিকা
ফুটিয়াছে? হায়, হায়, ক্রূর পিপীলিকা
কুসুমের মর্ম্মে পশি করেছে আতুর।
কল্পনার শিল্পশালা নিরালয় বসি
মধ্যাহ্নে ধরেছ কেন পূরবী রাগিনী?
থাম, থাম চিত্রগুলি পড়ে খসি খসি!
রঙে রঙে মেশামেশি আপনা আপনি!
কোথায় চিত্রিব আমি অনঙ্গমোহিনী,—
হাদে দেখ, চিত্রিয়াছি শঙ্কর ঘরণী!

উপরের গৌরচন্দ্রিকাটি কবি দেবেন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁহার অনেক কবিতাতেই এইরূপ গৌরচন্দ্রিকা আছে, সেগুলি কবিতাটিকে একটি বিশেষ অর্থযুক্ত করিয়াছে।

হাস্য ও করুণ উভয় রসেই দেবেন্দ্রনাথ সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। 'বিধবার আর্সি', 'কৌটার সিঁদুর', 'এই নাও', 'দাও দাও' প্রভৃতি কবিতায় আছে পতিবিয়োগিনীর করুণ চিত্র। সামাজিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধেও তিনি কবিতা লিখিয়াছেন বহুদিন পরে স্বামী বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়াছেন সে সময় পতিব্রতা পত্নীর মনের ভাবের চিত্রও তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন অনুভূতির তুলিকায় ভাবরসের রঞ্জনে। এগুলি প্রায় সমস্তই তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনাবলী হইতে সংগৃহীত।

দরিদ্র গৃহস্থের গৃহ, গৃহকর্ত্তা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। ননদিনী ভ্রাতৃবধূকে মলিন বেশ ত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন হইয়া স্বামী সম্ভাষণে যাইতে অনুরোধ করিলে উত্তরে ভ্রাতৃবধূ বলিতেছেন,

"এতদিনে মহাব্রত সাঙ্গ হ'ল মোর,
রাখ্ বোন ফুল, তেল, গুঁজি কাঠি ডোর!
সময় বহিয়া যায়, কি হবে সাজ সজ্জায়?

* * *

বাড়ি ফিরে এল পতি   চির বিরহিনী সত।
হাসিছে মধুর কিবা গাল ভরা হাসি
গেল গেল মোর নেত্র অশ্রুজলে ভাসি।

দেবেন্দ্রনাথ মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন কিন্তু হিন্দুধর্মের গ্লানিকর প্রথাগুলিকে তিনি কখনই সমর্থন করেন নাই। বিধবা তাঁহার চক্ষে ব্রতচারিণী দেবী, বিধবার 'একাদশী' প্রভৃতি নিয়মপালনও তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন কিন্তু লোকাচারে বিধবার প্রতি নির্য্যাতন, শিশু বিধবাকে নির্জ্জলা একাদশী করান, কুলীন কন্যার দুর্ভাগ্য প্রভৃতি সামাজিক দারুণ অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন। একটি শিশু বিধবা একাদশী তিথিতে কি ভাবে দারুণ তৃষ্ণায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল তাহার একটি বাস্তব চিত্র তিনি তাঁহার কবিতায় অঙ্কিত করিয়াছেন:

আট বছরের মেয়ে হয়েছে বিধবা আহা
ম্লান মুখে বসে সে রয়েছে,
আজ তার একাদশী, তাই গো জননী তার
জল খেতে বারণ করেছে।

* * * *

দ্বিপ্রহরে কহে বালা   জননীরে সম্বোধিয়া
দে রে মাগো জল একটুক্,
"না রে বাছা, জল খেলে   মহাপাপ হবে তোর
অমনি বালিকা হয় চুপ্।"

সংস্কার কিভাবে মাতৃস্নেহকে পরাভূত করে তাহার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত:

[illegible] জলের কুম্ভ হইতে জল খাইতেছে রাখিয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু ব্যক্তি আর তাহার থাকিল না, মধ্যরাত্রেই জল পিপাসায় অবসন্ন মেয়েটি মারা গেল।

কুলীন কন্তার কাহিনী একটি দীর্ঘ কবিতা, কয়েক ছত্র তাহা হইতে তুলিয়া দিতেছি ঃ

"কুলীনের বধূ আমি, অতি শিশু যবে
সেই কবে কোন্ কালে হয়েছে বিবাহ,
মনে নাই পতিমুখ, বিংশতি বরষ
হ'ল ক্রমে অতিক্রম; আমি পিত্রালয়ে
গণিতেছি দিন মাস; কত সংবৎসর!
কোথায় কোথায় পতি, হায়রে কোথায়।

* * *

দেবালয়ে জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকার কাছে
ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি কত শত বার
করপুটে শাশ্রুনেত্রে মাগিয়াছি বর
বারেক দেখাও মাগো, নাথেরে আমার!"

কিন্তু যে দিন স্বামী আসিলেন সেদিন স্বামী তাঁহার অঙ্গের গহনাগুলিই সর্ব্বাগ্রে চাহিলেন, তখন কুলীন বধূ বুঝিলেন যে, কুলীন বধূর যিনি স্বামী —তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন বিবাহ ব্যাবসায়ী মাত্র; সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সকল স্বপ্ন নিমেষে অন্তর্হিত হইল।

'কোকিল' নামে একটি কবিতা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত। তখন হেমচন্দ্র জীবিত ছিলেন, কিন্তু বহুদিন কোন কবিতা রচনা করেন নাই। তাই কবি তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন, "আজ বঙ্গ-ভারতীর উদ্যানে বসন্ত-উৎসব। মদনের প্রিয়তরু অশোক মুকুলে মুকুলে ভরিয়া গিয়াছে। চারিধারে ভ্রমরের গুঞ্জন, শ্যামার শীষ, পাপিয়া দোয়েল প্রভৃতি পাখীর সুর-ঝঙ্কারে কানন ঝঙ্কৃত হইতেছে

এ সময় হে কোকিল তুমি কেন নীরব? তোমার বসন্ত গীতি শুনিবার জন্য বনভূমি ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে।"

'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

বঙ্কিমচন্দ্র।

সেই ফটকের পাশে ভৃঙ্গেরে সম্ভাষি
কহিনু "হে ভৃঙ্গ, তব বিচিত্র পরাণ
জানে না কি শ্রান্তি? হায় সারাদিনমান
পুষ্পকুঞ্জে ছুটাছুটি; তোমারে সাবাসি!
সাবাসী হে মধুপ্রিয়, আইল তামসী
এখনো যূথীর গৃহে করিছ সন্ধান!
এখনো নাচিছে তব সতৃষ্ণ নয়ন
শেফালীর কুঁড়ি হেরি! হাসিছে অতসী!
সারাটি দুপুর তুমি বরটির সাথে
করি দ্বন্দ্ব, মকরন্দ ভখিয়াছ সুখে
তীব্র হলাহলপূর্ণ আকন্দের পাতে,
(শুনিয়াছি গুণপণা ধুতুরার মুখে)
কোথায় মৌমাছি? মোর ভাঙিল চটক,
বঙ্কিমবাবুর এযে গৃহের ফটক?

—মনে হয় যখন এ কবিতা লেখা হয় বঙ্কিমবাবু তখনও লেখনী ত্যাগ করেন নাই।

তাঁহার করুণ রসের কবিতায় একাধারে কারুণ্য ও মাধুর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'নীরব বিদায়' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :

"এ জগতে নীরব বিদায়,
পুষ্প ভ্রষ্ট সৌরভের প্রায়!
জননীর দৃষ্টি হ'য়ে বালকেরে সঙ্গে ল'য়ে
সন্তানের পাঠগৃহে ধায়!

'ভাসান' গঙ্গার তীরে, রথযাত্রা দেখিবারে
নয়ন মণিরে মাতা সাজায়ে পাঠায়,
নিজে কিন্তু স্নেহময়ী বাতায়নে বসি ওই
একমনে কি বস্তু ধায়!
চক্ষে অশ্রুজল নাই, কায়া নাই, ছায়া নাই,
ভাষায় ও বোঝানো কি যায়?
হায় ও যে নীরব বিদায়!

আশঙ্কায় চক্ষু বুঝি দুটি অন্ন মুখে গুঁজি
ওই যুবা কার্য্যালয়ে ধায়—
—প্রাণের স্বামীর তরে তাম্বুল লইয়া করে,
বধূ তার দিতেছে বিদায়
মর্ম্মে গাঁথা নীরব ভাষায়!
জলে শশী ছায়া প্রায় 'বিদায়' কি উথলায়
তরুণীর নয়ন কোণায়?
ও বিদায় কায়াহীন ও বিদায় ছায়াহীন
বোঝা যায় হিয়ায় হিয়ায়।
আকুলি ব্যাকুলি নাই অধরে কাঁপুনি নাই,
ভাষায় ও বোঝানো কি যায়?
হায়, ও যে নীরব বিদায়!
হের দেখ একমাত্র সন্তান রতন
দূর দেশে যায়,—
অন্ন, অন্ন, অন্ন, চাই বিনা বাক্যে যায় তাই,
ঘরে ঘরে এ কাহিনী দুঃখী বাঙ্গলায়!
পিতা মাতা দেয় পুত্রে নীরবে বিদায়।

ফেলে না চোখের জল,	পাছে হয় অমঙ্গল,
দীর্ঘশ্বাস নাসায় মিলায়!
শশী গেল অস্তাচলে,	যামিনী শিশির ছলে
কাঁদিতে না পায়!
অধরে কালিমা নাই,	নয়নে ভাবনা নাই,
ভাষায় সে মূক ব্যথা বোঝানো কি যায়?
হায়, ও যে নীরব বিদায়!

দেখিবে? দেখিতে চাও নীরব বিদায়?
ওই মৃতা বৃদ্ধার শয্যায়—
চেয়ে দেখ নীরব বিদায়!
বুড়ার নাহিক সুখ,	বুড়ার নাহিক দুঃখ
বুড়া দেয় নীরব বিদায়!
তোমাদের সুখ আছে,	তোমাদের দুঃখ আছে,
বুড়ার সর্ব্বস্ব চলে যায়—
চির তরে—চির তরে হায়;
হায় ওযে আশা-হারা	কোন মতে ছিল খাড়া
প্রান্তরের বজ্রদগ্ধ রসালের প্রায়,—
ভূমিকম্পে শুষ্কতরু ভূমিতে লুটায়।
চক্ষে অশ্রুজল নাই,	অধরে কাঁপুনি নাই
বিন্ধ্যাচলে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রায়,—
হায় ওযে নীরব বিদায়।

এইবার তাঁহার সরস ও হাস্যরস পূর্ণ বর্ণনারও কিছু উদাহরণ না দিলে কবির পরিচয় দান অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। এই সকল উদাহরণের জন্য তাঁহার কবিতা উদ্ধৃত না করিয়া উপায় নাই, কেননা পাঠক কেবল কবির ভাষা

হইতেই সেই রচনা-মাধুর্যের পরিচয় পাইতে পারেন। বস্তুতঃ সেই সকল কবিতা এতই মনমুগ্ধকর যে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ দুরূহ হইয়া উঠে।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সরল শিশুর মতই অকপট ছিলেন, তাঁহার নিজের সম্বন্ধে অন্যের মুখ দিয়া যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন তাহা একাধারে সরল সরস এবং হৃদয় গ্রাহী।

"লোকে বলে, সবই এর অদ্ভুত ব্যাপার।
দু'সন্ধ্যা জোটেনা অন্ন হেন দশা যার,
লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র যেই—
সেও কিন্তু দেয় এবে প্রীতি-উপহার!
সেও কিন্তু করে এবে প্রীতি-নিমন্ত্রণ,
আদর-ক্ষীবাম্বু-স্বাদু-পিয়ায় যতনে।"

* * *

লোকে বলে, এর হায় এমনি সুরীতি
পত্র লিখ এবে, তুমি তাহার উত্তর
পাবে না (হাসির কথা) দুইটি বৎসর।
(ধৈর্য্যের আশঙ্কা স্থল) (বন্ধুত্বের ভীতি)
তবু কিন্তু এর প্রতি বিরাগ অপ্রীতি
কভু নাহি জনমিবে তোমার পরাণে।"

বহুকাল তাঁহার কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে ছাপা হয় নাই, বন্ধুবর্গের যত্নে সমস্ত কবিতাগুলি বিভিন্ন গ্রন্থের আকারে একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি তখন বন্ধুগণকে নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন ;—

এ মূর্ত্ত ফিনিক্স
তোমাদের মন্ত্রসিদ্ধ বিদ্যুৎ-পরশে
ঝট্‌পট্‌ ইন্দ্রধনু পালক বিস্তারি
হইবে কি বিশ্বরমা জীবন্ত বিহগী?

এইসব বলিলেও তাঁহার নিজের কবিতার প্রতি প্রীতিও ছিল এবং শ্রদ্ধাও ছিল। 'দেবেন্দ্রের চিত্তনন্দনের সুন্দরী কবিতা বধূ' প্রভৃতি উক্তিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

যাহা হউক বন্ধুগণের চেষ্টায় কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল ;

করিলাম নিবারণ, শোনেনা শোনেনা
নিবারণ। করিবেই গ্রন্থ সুপ্রকাশ,
সুপ্রকাশ। * * *
শুধু তাই নয়—এরা চিক্কণ কাগজে,
রেশমী মলাটে, সাজাইয়া বরতনু
বোর্ণ সেফার্ডের মবি তুলিকার গুণে
করিয়া সংস্কার মোর শ্রীহীন মূরতি,
(বিবাহ-কৌতুকে যথা তেজবরে বরে
করে সুসজ্জিত যত স্নিগ্ধজন তার)
ফোটো সহ কাব্য গ্রন্থ করিবে প্রচার !

ফটোর সহিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল এবং কবির আনন্দের সীমা রহিল না। লোকে তাঁহাকে কত কথা শুনাইয়াছে,

কেহ বলে, "আছে এর শিরোরোগ ব্যাধি,"
কেহ বলে, "এ কবিটি নিশ্চয় পাগল।"

আবার এমনও কেহ বলে,—

"কেহ বলে, এ কবিটি পিয়ে মনঃ সাধে
সোমরস, হের ওর রক্তিম নয়নে
মাদকতা ; আমি হাসি মিথ্যা অপবাদে।"

তাঁহার এই মত্ততার উৎস যে তাঁহার প্রিয়ার প্রেম, তাহা তো কেহই জানে না।

"তুমি গো মদির আঁখি, প্রাণের পিয়ালা
দাও ভরি সুধারসে; আমি হ'য়ে ভোর
পিই তাহা সুধামুখী।"

সকলের উপরেই তাঁহার ভালবাসা, সেই ভালবাসার উৎস স্বরূপিনী আছেন তাঁহার গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে।

"তুমি শিখায়েছ মোরে, অয়ি স্নেহলতা,
পশু পক্ষী দাস দাসী জীব সমুদায়
সবারে বাসিতে ভাল,—
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হয়ে বয়,
জীব দুঃখে, নারীরূপা কে তুমি দেবতা।"

* * * *

সজনি, জানেনা এরা নির্ব্বাক নীরবে
তোমার আয়ত চক্ষু (মুখে নাহি বাণী)
ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে।
মুগ্ধ হ'য়ে শোনে শ্রোতা তাই সেই কথা।
বশম্বদ বন্ধুবর্গ জানে সে বারতা—
মুখর প্রেমের উৎস মোর নীরবতা?"

* * * *

কনকের কাজ করা, স্বর্ণফুলে ভরা
তুলি রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ি
অয়ি গৃহস্থের বধূ, অযত্ন-অম্বরা
বিশ্বের সৌন্দর্য্য তুমি লইয়াছ কাড়ি।
আলুথালু কেশপাশ, মাথার বসন
চরণে লুটায়ে পড়ে ব্যস্ত গৃহ কাজে
গৃহরাজ্ঞী, তবু নম্র গৃহবধূ সাজে।

*   *   *   *

নয়—নয় উন্মাদিনী কবির প্রতিভা,
তিমির-পুঞ্জের কুঞ্জে যামিনী যেমনি
ফুটায় জ্যোৎস্নার দ্যুতি, তুমিও তেমনি
কবি-চিত্ত অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভা।"

দেবী ভারতীকে তিনি মাতৃমূর্ত্তি রূপে আহ্বান করিয়াছেন, কখনও বলিয়াছেন,

"আয় মা আয় মা আজি ম্যাডোনার বেশে
অঙ্কারোহী তোর ওই শিশু খৃষ্টে ল'য়ে।"

আবার বলিয়াছেন,

"যদি চাস্ আয় মাগো, যশোদার রূপে।"

তাঁহার দেবী বাগ্‌বাদিনীর উক্তি,—

"আমি প্রেম, আমি প্রীতি, আমি ভালবাসা
আমি জ্ঞান, আমি শক্তি, ধার্ম্মিকের আশা,
মৃত্যুর তরঙ্গ মাঝে আমি মহাপ্রাণ,
আমি পুণ্য, আমি ভক্তি, আমিই কল্যাণ।"

আবার তিনিই মৃত্যুরূপা :

কঙ্কালের দল মাঝে দুর্ভিক্ষ হইয়া,
নাচি আমি মুক্তকেশে তাথিয়া তাথিয়া।"

অলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"হে অলক্ষ্মী, অতি সত্য এই গূঢ় কথা
ধর্ম্ম-মন্দিরের তুমি অপূর্ব্ব দেবতা।"

ধনী হইয়া একা একা সম্পদ ভোগ করা অপেক্ষা কবির মতে বহু-আত্মীয় লইয়া দারিদ্র্য দুঃখে দিনপাতও স্পৃহনীয় :

"কভু না কভু না রব একা,
খুড়্তুতো, মাস্তুতো, জাঠতুতো ভাই
সইয়ের বোয়ের বেগুণ-ফুলে
যে যেখানে আছে পিতৃ মাতৃ কুলে
সবারে জড়াই,—
'ডাল ভাত শাকের চচ্চড়ি
মোচা থোড়, পুঁইশাক, কুমড়ার বড়ি,
মিলে মিশে দুইবেলা খাই
হয়ে' রব দোকা।
সে দোকাত্বে ভরি যাবে বুক,
কোথা পাবে সে পুরন্ত সুখ
ইন্দিরার বরপুত্র, কুবেরের সখা।"

'পুরন্ত সুখ' অর্থাৎ পরিপূর্ণ সুখ। এই ভাবের বাক্যবিন্যাস তাঁহার কবিতার অন্য স্থানেও আছে। একদিকে তাহার কবিতা নৃতপরা নটিনীর নৃত্যের নুপুর ঝঙ্কারের ন্যায় ছন্দের মধুর ঝঙ্কার, আবার অপর দিকে মিল না হইলেও ভ্রূপেক্ষ নাই।

তাঁহার নবীনা নাতিনী নৃত্যকালী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন,—

—নবীনা নাতিনী মোর নাম নৃত্যকালী,
নিউ ইয়াস´ দিনে যথা নাবেন্জার ডালি।

তাঁহার নাতিনী বিদ্যাবতী, তিনি আসিয়াই তাঁহার দাদু ও দিদিমার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে দাদুর কবিত্ব ও সেই কবিত্বের লক্ষণগুলি সম্বন্ধে দিদিমার সহিত আলোচনা হইতে হইতে ক্রমশঃ সাধারণ ভাবে সাহিত্যিকগণের সমালোচনা আরম্ভ হইল। বিদ্যাবতী নাতিনী, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কাহাকেও সমালোচনার কষাঘাত হইতে বাদ দিলেন না। অতঃপর সে আক্রমণ আসিয়া পড়িল কাছাকাছি,—

"হেনকালে ছাড়ি মফঃস্বল আলোচন,
নাস্তিনী সদরে আসি কৈল আক্রমণ;
অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রে ভানুসিংহে ছাড়ি,
মোরে লক্ষ্যি রসনায় তোপ দিল দাগি।
(ছাড়ি আর দাগিতে হল না ভাল মিল!)
বঙ্গীয় সমালোচক কিল খেয়ে কিল
অনায়াসে করে চুরি সাহিত্য-বাজারে,
তাইতে সাহস হৈল তব দরবারে
হে পাঠক, ছত্র দুটি করিবারে পেশ্‌।)

'বিংশ শতাব্দীর বর' কবির একটি রহস্যাবৃত কবিতা। কবিতাটির ভিতর কিছু সত্য আছে অথবা ইহা নিছক কল্পনা বুঝা কঠিন হইলেও মনে হয় ইহার ভিতর কিছু কিছু সত্য আছে, কেন না দেবেন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই তাঁহার প্রত্যক্ষ বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।

মোটের উপর কবিতাটি একটি বিদ্রূপাত্মক কাহিনী। কাহিনীর সারাংশ এইরূপ;—

স্থান এলাহাবাদের একটি কাট্‌রা অর্থাৎ বহু গৃহ ঘন সন্নিবিষ্ট পল্লী। পল্লীটি প্রধানতঃ প্রবাসী বাঙ্গালীর আবাস-স্থল। সেই পল্লীতে 'দত্তজা' বাস করেন তিনি এক বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতা। বিবাহযোগ্যা অর্থাৎ তখনকার দিনের বিবাহযোগ্যা।

কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ কতকটা স্থির হইয়াছে, কিন্তু;—

"এখনো বিবাহ দিন হয় নাই ধার্য্য,
এখনো পণের টাকা (আসল যা কার্য্য)
হয়নি যোগাড়। কর্ত্তার ভাবী বেয়াই—
(মরে যাই লয়ে তাঁর গুণের বালাই)
চাহিয়াছিলেন পূর্ব্বে বিশ হাজার মুদ্রা,

দত্তবাবুর চক্ষু হ'তে পলাইল নিদ্রা
সে প্রস্তাব শুনি, বহু বাক্য ব্যয়
বহু পত্র লেখালেখি করিল উভয়
পক্ষ। লক্ষ কথা পরে হইল নিশ্চয়
বরকর্ত্তা লইবেন দশ হাজার মুদ্রা
কন্যা-কর্ত্তা-ভাণ্ডার হইতে। এবে নিদ্রা
মাঝে মাঝে দেখা দেয় দত্তবাবু চক্ষে।

দশ হাজার টাকা এখনও সংগ্রহ হয় নাই, মাত্র পাঁচ হাজার সংগ্রহ হইয়াছে।

ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে,—অর্থাৎ যখন কাট্‌রাবাসী ও বাসিনীগণ আহারান্তে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় মগ্ন তখন সকলের সুখসুপ্তি ভঙ্গ করিয়া সহসা 'উলু' ধ্বনি উত্থিত হইল। এই উলু ধ্বনির কারণ কি ?

বিন্দি দাসী দত্ত গৃহের পরিচারিকা, রহস্য প্রিয়া এবং বাঙালিনী, সুতরাং বিবাহ-ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহশীলা। সেই 'উলু' দিয়া উঠিয়াছে।

"উলু, উলু, উলু, উলু উলুর ফোয়ারা
মুখে ছোটে, বিন্দি দাসী হেসে হ'ল সারা।
সে হাসি নির্ঝরে ভাসি যত দাস দাসী
দেয় উলু।"

বাঙাদিদি ছিলেন সমস্ত কাট্‌রার বাঙাদিদি এবং অভিভাবিকা ;

বাঙ্গাদিদি মহাক্রোধে আসি
রাঙ্গাইয়া দুই আঁখি, কহেন, 'সাবাসি
তোদের উলুর কাণ্ড, হারাইলি জ্ঞান
ওলো বিন্দি, বহাইয়া আনন্দ তুফান
ভাসাইয়া দিবি কিলো সমস্ত কাট্‌রা ?
সাবাসি বুকের পাটা, হাসির গর্‌রা

কোথা বিয়া', কোথা বর ! কিছু নাহি ধার্য্য'
হ্যা দ্যাখ্‌ হাসিব ঘটা উলুর ঐশ্বর্য্য !
দত্তজা (বাড়ীব কর্ত্তা) সে মধ্যাহ্নকালে
অন্তঃপুবে নিজকক্ষে, আলবোলা গালে
পুবি ছিলেন আরামে। তাম্রকুট ধূম
আনিত মুহূর্ত্ত পবে আবামেব ঘুম
এ উলু চিৎকাব শুনি নাসিকাব ডাক
গেল থামি, ধায় বুড়া হইয়া অবাক !
"কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? 'বব আসিয়াছে ?"

বব কোথায় আসিয়াছে, কি কবিয়াই বা আসিল ? দেখা গেল পোস্টাফিসেব ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল রূপে প্রেবিত হইয়াছে বব কাশী হইতে এলাহাবাদে কন্যাব বাড়িতে। একজন ডাক পিয়ন ববটিকে লইয়া আসিয়াছে।

এদিকে অন্তঃপুবে ঘন ঘন উলুধ্বনি উঠিতেছে।

"উলু, উলু, উলু, উলু" সে আনন্দধ্বনি
ঘটাইল অন্তঃপুবে রঙ্গ বণবণি।
না হইতে আশীর্ব্বাদ আসিয়াছে বব,
বধূ ও কন্যার দল হইল ফাঁপব।"

উলুব শব্দ তখন পাড়ায় গিয়া পৌছিয়াছে।

পাড়াব রূপসী দল কাতাবে কাতাবে
ছুটিল গবাক্ষ-দ্বাবে জানেলাব ধাবে।
এ মধ্যাহ্নকালে তারা বিন্তি, গ্রাবু, পাশা
খেলিতে আসিয়াছিল ! হেরিতে তামাসা
ছুটিল সকলে, বল কোন্‌ বাঙালিনী
নীববে রহিতে পারে শুনি হুলুধ্বনি ?

গোবিন্দ দাস বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া আকুলা ব্রজবালাগণ কিভাবে এক অঙ্গের অলঙ্কার অন্য অঙ্গে ধারণ করিয়া উন্মনা হইয়া ছুটিয়াছিলেন সেই ধ্বনিকে অনুসরণ করিয়া। এলাহাবাদের কাটরার রমণীবৃন্দ উলুধ্বনি অনুসরণ করিয়া সেই ভাবেই ছুটিয়াছেন দত্ত গৃহের অভিমুখে,—

"কোন ধনী, স্বামীর বিনামা হস্তে ধরি
ধুলি ঝাড়ি রাখিতেছিলেন যত্ন করি,
শয্যাগৃহে, অকস্মাৎ হুলুধ্বনি শুনি,—
(হরিণী শুনিল যেন বাঁশরীর ধ্বনি !)
অন্যমনা হয়ে ধনী, মাথায় বহিয়া
জুতা জোড়া তীরবেগে চলিল ছুটিয়া !"

কেহ বা সখীর প্রার্থনা মত তাঁহার জন্য পান সাজিতেছিলেন, সাজা পানটি তাড়াতাড়ি নিজের মুখেই পুরিয়া ছুটিলেন।

"তনয়া-বৎসলা কোন, লজেঞ্চেস গুলি
নিজ মুখে পুরি হর্ষে আকুলি ব্যাকুলি
শুনি সে উলুর ধ্বনি চলিল ছুটিয়া
পিছে ক্ষুদ্র শিশু ধায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া।"

বাড়ির বাহিরের দৃশ্য আবার আরও অপূর্ব্ব।

বাহিরে অদ্ভুত দৃশ্য, লোকে লোকারণ্য !
উপস্থিত তথা কত গণ্য আর মান্য
বঙ্গের কৃতী সন্তান, এ কিরে তামাসা !
সকলে অবাক কারো মুখে নাহি ভাষা।

কর্তা কন হাত যুড়ি, "ভায়া অবিনাশ,
কিছুই বুঝিতে নারি, উপজে তরাস !

ভবিষ্য জামাই মোর হ'ল কি পাগল?
দড়াদড়ি দিয়ে এর প্রত্যঙ্গ সকল
বেঁধেছে কি ল'য়ে যেতে বাতুল-আগারে?
সহাস্যে ডাক্তার কন 'এ মস্ত ব্যাপার!
নাহি মম হস্ত,

"Your son-in-law is sound
Can't guess why with ropes he bound"

ছিলা বসি মধ্যস্থলে শ্রীরাম দারোগা
কৌতুক বিষাদে ক'ন "আমি কি অভাগা!
এত দড়াদড়ি, তবু মাথায় টোপর!
অপরের করধৃত, তবু নহে চোর!"
পাশে বসি ছিল তথা সাহিত্য-আনন্দ
প্রবাসীর সম্পাদক বন্ধু রামানন্দ।

তাহারে বলিনু আমি, "এত দিন পরে
তোমার ভবিষ্যবাণী অক্ষরে অক্ষরে
ফলিয়াছে; তুমি যারে 'সঞ্জীবনী পত্রে
কল্পনায় হেরেছিলে, এ প্রয়াগ ক্ষেত্রে
এই দেখ আসিয়াছে সত্যই সে বর—
ভি. পি. পার্শেলেতে মরি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর!

*　　*　　*　　*

"এত 'উলু উলু' ধ্বনি, এত যে আনন্দ,
গৃহকর্ত্তা রাম দত্ত তবু নিরানন্দ!

কেননা ভি. পি. পার্শেলটি দশ হাজারের, কিন্তু কন্যাকর্ত্তার হাতে পাঁচ হাজারের বেশী টাকা নাই, সুতরাং পার্শেল খালাস করা তাহার সাধ্যের অতীত।

তখন অগত্যা সকলের পরামর্শে 'Refused' লিখিয়া সেই লেখাটি বরের কপালে লাগাইয়া দেওয়া হইল।

এই দৃশ্যে সকলে হাসিয়া উঠিল।

বাতায়ান জালে
হেরিনু কন্যার মা' তা কাঁদিল নীবরে
মূর্ত্তিমতী কাতরতা সে হাসি উৎসবে।

কবিতাটিব প্রথম অধ্যায় 'পূর্ব্ববব'। ইহার পবেব অধ্যায় 'উত্তর বরে' দেখা গেল পিওন প্যাকেটরূপী ববকে লইয়া পোস্টাফিসে ফিরাইয়া দিতে চলিয়াছে, বিন্দি দাসী আসিয়া তাহাকে বাস্তায় ধরিয়াছে। বিন্দি চোখ ঘুরাইয়া, মুখ ঘুবাইয়া, পিওনেব মুণ্ড ঘুবাইয়া দিয়া তাহাব নিকট একটি প্রস্তাব কবিল,—

"এই দুটি টাকা
লও বাপু—সোজা কথা বিন্দি আঁকা বাঁকা
কথা নাহি জানে—একবাব গুপ্তদ্বাব
দিয়া, জামাতাবে দেখাইয়া যাও,
শাশুডীর বড সাধ দেখিবাবে তাঁর
জামাতাব চাঁদমুখ।" * * *

পোস্টদূত হইল বাজি; প্যাকেট লইয়া,
খিডকীব দ্বার দিয়া দুইজনে গিয়া
উপস্থিত অন্তঃপুবে, মুখ ফিরাইয়া—
কিছু দূবে পোস্টদূত বহিল বসিয়া।

বাঙাদিদি সলজ্জা কম্পান্বিত-কলেববা কন্যাটিকে লইয়া বরের কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাকে সেখানে বাখিয়া চলিয়া গেলেন জামাতার আহাবের আয়োজনে;—

তখন,

লাজগ্রস্ত বধূ আব বর,
কি কবিবে, কোথা যাবে ভাবিয়া ফাঁপর !

বব একবাব মুগ্ধদৃষ্টিতে ব্রীডানম্রা বালিকাটিব দিকে চাহিল।

কবি বলিতেছেন,

যুবক কহিল হর্ষে, "লো আনন্দবাশি;
আমি তব চিরদাস, বালা মৃদু হাসি
লাজনত নেত্রে, শীঘ্র চঞ্চল চবণে
পলাইল, যুবা চাহে আকুল নয়নে।"

এই সব ঘটনা কবি জাগ্রত চক্ষে অবশ্য দেখেন নাই কিন্তু মানসনেত্রে সমস্তই দেখিয়াছেন। আবও, তিনি জানেন, সেই এক মুহূর্ত্তেই—

উভয়ে উভয়
বাসিলরে ভাল, হল চিত্ত-বিনিময়।

কবি বলিতেছেন, "এ আমাব জানা কথা। কামগন্ধহীন সবল প্রেম কখনও অসার্থক হয় না।"

"হে পাঠক—শোন বলি, কভু নহে ভুল,
বৃথায় পাকেনি মোব এ বিপুল চুল !"

সম্ভবতঃ যখন এই কবিতাটি লেখা হয় তখন কবিব চুল পাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কবিজনেব চুল পাকিলেও তাঁহারা যে বুডা হ'ন না স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহার সাক্ষী আছেন। অতঃপব বব পলাইলেন অজ্ঞাতবাসে কাশ্মীবে, ছয় মাস তাঁহাব কোন উদ্দেশ না পাইয়া পিতা অবশেষে ঘোষণা কবিলেন, "আমি বিনা পণেই পুত্রেব বিবাহ দিব, পণ-গ্রহণ অতি গর্হিত কার্য্য"

রস-বচনা ও ব্যাঙ্গ-বচনায় কেবল পদ্যে নয় গদ্যেও দেবেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভারতীতে প্রকাশিত 'দগ্ধ-কচু' নামক ব্যাঙ্গ রচনা পাঠকেব

মনোহরণ করিয়াছিল। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত 'প্রবাসী'তেও তিনি 'কমলাকান্ত' এই ছদ্মনামে রসরচনা বাহির করেন।

দেবেন্দ্রনাথ প্রেমের কবিতা অনেক লিখিয়াছেন, সে সকল কবিতাও যেন পবিত্র মাধুর্য্যে পূর্ণ, তাই তাঁহার কবিতার তুলনা দিতে গিয়া "যেন দেবতার নির্ম্মাল্য পুষ্প" এই একটি মাত্র তুলনাই মনে আসে।

স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত 'বঙ্গবীণা' নামক গ্রন্থে কবি দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন।

"দেবেন্দ্রনাথ খুব সম্ভব ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ওকালতী করিবার জন্য অনেক দিন গাজীপুরে ও এলাহাবাদে ছিলেন। যখন এলাহাবাদ হইতে 'প্রবাসী' মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, তখন তিনি প্রবাসীতে বহু কবিতা ও 'প্রয়াগধামে কমলাকান্ত' এই নাম দিয়া রঙ্গ রচনা লিখিয়া অতি সত্বর সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া উঠেন। পরে তিনি 'সাহিত্যপত্রে'ও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন ও 'সাহিত্যে'র সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির যত্নে "অশোকগুচ্ছ" নাম দিয়া তাঁহার কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। পরে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িলে তিনি ওকালতী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া 'শ্রীকৃষ্ণপাঠশালা' নাম দিয়া একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। * * এই সময় কবি অত্যন্ত অর্থকর্ষ্য ভোগ করিতেছিলেন ও তাঁহার চক্ষু ক্রমশঃ অন্ধ হইয়া আসিতেছিল। * * ১৯২০ খৃস্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু হয়।"

১৩২৭ সালের পৌষের 'মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যু সংবাদ এইভাবে প্রকাশিত হয়:—

"আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেরাদুন শৈলাবাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে ওকালতী ত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্য লাভের আশায় নানা স্বাস্থ্যকর

স্থানে পর্য্যায় ক্রমে বসতি করিতেছিলেন। দেরাদুনে অনেক দিন ছিলেন। কলিকাতায় 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামক বিদ্যালয় তাঁহাবই স্থাপিত; ঐ বিদ্যালয়ে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কলিকাতায় আসিয়া বৎসরাধিক কাল অবস্থান করেন। পীড়িত হইয়া পুজাব পূর্ব্বে তিনি দেবাদুন চলিয়া যান, সেইখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

অধ্যাপক কৃষ্ণ বিহারী গুপ্ত মহাশয় তাঁহাব সহিত জব্বলপুবে সাক্ষাৎ কবেন, সে সময় তিনি তাঁহাব কাব্য সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্র নাথকে বলেন, "আপনাব কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাবশূন্যতা আপনাকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে তাহাতেই আপনি বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলাব ববেণ্য কবি হইয়াছেন।" অধ্যাপক মহাশয় ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'সঙ্কল্প' পত্রিকায় কবি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কবির সহিত তাঁহাব আলোচনাব বিবরণ দিয়াছিলেন, সেই আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথেব প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি আমাব চেয়ে বছব তিনেব ছোট হইবেন। বডই আনন্দেব বিষয় যে, তাঁব পঞ্চাশ বৎসব বয়স হওয়াতে একটা খুব বড রকমেব আনন্দোৎসবেব আয়োজন হইতেছে। আমি এই উৎসবে একটি কবিতা লিখিব মনে করিতেছি।" ১৯১১ খৃস্টাব্দ।

প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "১৯০৪ খৃস্টাব্দে জুলাই মাসে আমি বঙ্গপুবে প্র্যাকৃটিস কবিতে যাই। ডাক বাংলায় বাস করিতেছি, তখনও বাড়ি পাই নাই। * * বেলা আন্দাজ নয়টা, আমি মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিতেছি। এমন সময়, বগলে বৃহৎ খাতা লইয়া একজন ক্ষীণকায় প্রৌঢ ব্যক্তিকে বাবন্দায় দেখিতে পাইলাম। পর মুহূর্ত্তেই খানসামা একখানি কার্ড আনিয়া আমার হাতে দিল। * * * তাড়াতাড়ি বাহিবে গেলাম। আদব অভ্যর্থনা কবিয়া দেবেন্দ্রবাবুকে নিজ কামবায় আনিয়া বসাইলাম।"

প্রভাতবাবুর সহিত দেবেন্দ্রনাথেব চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও কবিতার ভিতর দিয়া অন্তরগত পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। প্রভাতবাবুব

কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন, "১৮৯০ কিংবা উহার কাছাকাছি 'ভারতী'তে দেবেন্দ্রবাবুর 'হরশিঙ্গার' বাহির হইল। তাহার পর 'ভারতী' ও 'সাহিত্যে' দেবেন্দ্রবাবুর কবিতার যেন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। কবিতাগুলি একেবারে নূতন ঢং-এর। কবির ঘর গৃহস্থালীর কথা, স্ত্রীর কথা, ছেলেমেয়ের কথা পড়িয়া পড়িয়া তাঁহাকে যেন আমাদের নিতান্ত আত্মীয়ের মত মনে হইতে লাগিল। তাঁহার মধুময় হৃদয়ের নানাভাবের ছবি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় মাঝে মাঝে আমরা দেখিতে লাগিলাম, দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।"

বঙ্গপুরে সাক্ষাতের সম্বন্ধে প্রভাতবাবু বলিযাছেন, "পরস্পরে এই প্রথম সাক্ষাৎ—অথচ যেন কত কালের পরিচয়, এইরূপ আগ্রহে, আনন্দে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।"

দেবেন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালার জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া গিয়াছিলেন, প্রভাত-কুমারের নূতন প্র্যাক্‌টিস, পাঁচ টাকার বেশী তিনি দিতে পারেন নাই, দেবেন্দ্রনাথ তাহাতেই খুসী হইয়া টাকাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আমার কবিতা আপনার কেমন লাগে? চক্ষু লজ্জার খাতিরে বাড়িয়ে বল্‌বেন না, ঠিক খাঁটি কথাটি বলুন।"

এইটিই ছিল কবি দেবেন্দ্রনাথের স্বভাব, সরল বালকের মত তিনি সকলের কাছেই এই প্রশ্ন করিতেন। "ভাল লাগিয়াছে" উত্তরটি পাইলেই খুসী হইতেন।

এখনও বোধ হয় দেশবাসীর নিকট তাঁহার সেই প্রশ্নটিই রহিয়া গিয়াছে। প্রবাসী এই বাঙ্গালী কবি বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় যেভাবে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার সার্থকতার বিচার ভার দেশবাসী সাহিত্যরসিকগণের বিচারের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তবে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায়, প্রবাসী বাঙ্গালী কবির আন্তরিকতা কাব্যের ভিতর দিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও শ্যামলা বঙ্গভূমিকে একই অন্তরের অকপট প্রেম বন্ধনে বন্দী করিয়া দূরত্বের ব্যবধান হইতে মুক্তি দিয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই।

কবি দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলী যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন ছোট বড় সকলগুলি মিলাইয়া প্রায় একই সময়ে বাহির হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কেবল 'অশোকগুচ্ছ' ও 'হরি মঙ্গল' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়।

গ্রন্থের নাম ও তালিকা এইরূপ :

১। ফুলবালা, ইহাই কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্য। ইহাতে ১৮টি ফুলের নামে কবিতা লেখা হইয়াছে। (গাজিপুর, ১৮৮০ খৃঃ ২৮শে জুন ১২৮৭ সন ৩৯ পৃঃ)।

২। উর্ম্মিলা কাব্য ৩৭ পৃঃ

৩। নির্ঝরিণী গীতিকাব্য ৬৫ পৃঃ

এই দুখানি পুস্তকই সন ১২৮৭ খৃঃ ১৮৮১তে প্রকাশিত হয়। গাজিপুর হইতে প্রথম খানি ১০ই জানুয়ারী ও দ্বিতীয় খানি ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত হয়।

ইহার পর 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকা হইতে সংগৃহীত কবিতাবলী লইয়া প্রায় একসঙ্গে দশখানি পুস্তক বাহির হয়।

সে গুলির নাম :	প্রকাশের সময়
৪। অশোক গুচ্ছ ১৪২ পৃঃ	
৫। হরি মঙ্গল ৬২ পৃঃ	১৩১১ মাঘ ইং ১৯০৫
৬। দগ্ধ কচু (রস রচনা)	
৭। শেফালি গুচ্ছ	১৩০৮ সাল জৈষ্ঠ্য
৮। পারিজাত গুচ্ছ ১৬০ পৃঃ	১৩১৯ সাল ১৯১২ খৃঃ
৯। জ্ঞানদা মঙ্গল ১৩ পৃঃ	১৩১৯ সাল ১৯১২ খৃঃ
১০। অপূর্ব্ব নৈবেদ্য ১৫১ পৃঃ	১৩১৯ সাল ১৯১২ ২৮শে অক্টোবর
১১। অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল ১০১ পৃঃ	১৩১৯ সাল ১৯১২ ২৯শে অক্টোবর
১২। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ১৮ পৃঃ	১৩১৯ সাল ১৯১২ ২রা নভেম্বর
১৩। অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা ৭১ পৃঃ	১৩১৯ সাল ১৯১২ ২রা নভেম্বর

সে গুলির নাম ঃ প্রকাশের সময়

১৪। গোলাপ গুচ্ছ ২২৮ পৃঃ ১৩১৯ সাল ১৯১২ ১৫ই নভেম্বর

১৫। শ্রীগৌবাঙ্গ মঙ্গল ১৬ পৃঃ

১৬। শ্যাম মঙ্গল ১৬ পৃঃ

১৭। জগদ্ধাত্রী মঙ্গল ১৮ পৃঃ

১৮। কার্ত্তিক মঙ্গল ১৬ পৃঃ

১৯। গণেশ মঙ্গল ১৬+৯ পৃঃ ইংবাজী অনুবাদ সহ

২০। খৃষ্টমঙ্গল ১৯+১২ পৃঃ ইংবাজী অনুবাদসহ

২১। অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা ৩২ পৃঃ

শেষোক্ত এই ছোট ছোট গ্রন্থগুলি সব প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

'অপূর্ব্ব বীবাঙ্গনা' ও 'অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা' এই দু'খানি কাব্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুসবণে লিখিত হইয়াছে। 'অপূর্ব্ব বীবাঙ্গনা' কাব্যে প্রথমে 'বন্দনা'য় মাইকেলকে বন্দনা কবা হইয়াছে এবং ইহাতে 'দশবথের প্রতি কৈকেয়ী' 'শ্রীকৃষ্ণেব প্রতি চন্দ্রাবলী' 'শ্রীকৃষ্ণেব প্রতি কুব্‌জা' ও 'লক্ষ্মণেব প্রতি ঊর্ম্মিলা' নামে চাবটি কবিতা আছে।

'দগ্ধ কচু' বস-বচনাটি ১৩০৩ সালেব 'ভাবতীতে' আষাঢ, অগ্রহায়ণ ও মাঘ তিন সংখ্যায় 'মেঘনাদ শত্রু' এস. এ. এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।

ঐ ছদ্মনামে ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভাবতী'তে 'স্বামী লড্ডু ও পেঁড়া' নামে একটি গল্পও বাহিব হইয়াছিল। কবিব 'প্রকৃতিব প্রতি' কবিতাব শেষ অংশ দিয়া প্রবন্ধটি সমাপ্তি কবিতেছি ঃ

অযি ববনাবি,
চিবদিন, চিবদিন, তুহাবি পূজাবি আমি,
তুহাবি পূজাবি !
ত্রিদিব আনন্দময়ী, ষোডশী, রূপসী তুই,
তোবে হেবি দুঃস্বপন গিয়েছি বিসাবি।

সঙ্গ-লিপ্সা, ভোগ লিপ্সা,　　　　মায়া মোহ সব
তুমি মম ঐশ্বর্য্য বিভব !
অকূলে পেয়েছি কূল　　　　তুমি এবে অনুকূল
জলধি গর্জ্জন চিতে হয়েছে নীরব।
প্রশান্ত এ বেলা মাঝে　　　তোমারি মুরতি রাজে
পঙ্কজবাসিনী যেন বারিধি কুমারী।
কর দেবী এ আশীষ　　　　মহানন্দে অহর্নিশ
হে কবি চির-বাঞ্ছিত, তোমারি তোমারি,
পারি যেন হইবারে প্রকৃত পূজারি।

'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা' কাব্য পরে লিখিত হইয়াছিল। ইহার প্রথমে 'বন্দনা' কবিতায় কবিগুরু মাইকেল মধুসূদনকে বন্দনা করা হইয়াছে :

"হে মধু, আছিলে য'বে এই ধরাধামে,
ছিল তব ও বদন সুহৃৎ-রঞ্জন,
নীলোৎপল, ঢলঢল সহাস লোচন,—
মোহিনী কবিতা দেবী, রতি যথা কামে,
গলে দিয়া বরমাল্য, ও মূর্ত্তি সুঠামে
মোহিয়া, সৃজিয়া মরি নব বৃন্দাবন,
কেলি-কদম্বের তলে, শ্রীমধুসূদন,
অর্চ্চিলা ও পাদপদ্ম, রাধা যথা শ্যামে।
হে গুরু, কখনো তোমা দেখিনি নয়নে,
কিন্তু দেব, দ্রোণ-শিষ্য একলব্য-সম
মানসে গড়িয়া তব মূর্ত্তি নিরুপম,
শিখিয়াছি—ধনুর্বিদ্যা তোমারি সদনে।
যারে শর ! স্বর্গে গিয়া শ্রীগুরু চরণ
ক'রে আয়, ক'রে আয় আনন্দ বন্দন !

তিনি মাইকেলের অনুসরণে 'অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা' নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। ইহার প্রথম কবিতাটির শেষ শ্লোকটি এইরূপ:

তোমার পদাঙ্ক-চিহ্ন করিয়া ধারণ
পাইল গোপিনী যথা তোমারে, শ্রীহরি!
তেমতি পদাঙ্ক-চিহ্ন হে মধুসূদন,
অনুসরি—হাব ভাব, লীলা, ক্রীড়া ধরি
এই নব 'ব্রজাঙ্গনা' হে ব্রজমোহন,
করিছে আহ্বান তোমা হাহাকার করি!
দাও দেখা, দাও দেখা, মুছাও নয়ন
দুঃখিনীর! কোথা তুমি, হে দয়াল হরি।
মনচোর! চোর নহে এ ব্রজকুমারী—
আমিও গো চোর নহি, ওহে লীলাময়!
না হারায় নামরূপ কোন নবনারী
প্রেমময়। তব প্রেমে হইয়া তন্ময়?
তোমারি এ বিশ্বকাব্য হে মধুসূদন,—
আমার কি সাধ্য করি নূতন সৃজন।

কবিতাটি দ্ব্যর্থ ভাবের, কতকটা কবি মধুসূদনকে উদ্দেশ করিয়া এবং সমস্তটাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথের কবিতা যেন দেবতার নির্ম্মাল্য পুষ্প। এই একটিমাত্র তুলনাই তাঁহার কবিতার সম্বন্ধে মনে আসে।

তিনি বন্ধুগতপ্রাণ, অন্য কবির কবিতার স্বাদে তাঁহার মন এমন ভরপুর হয় যে, সেই কবিতার কোন্ ভাষায় যে বর্ণনা করিবেন এবং প্রশংসা করিবেন তাহা ভাবিয়া পান না, তখন তাঁহার রচনা যেন আনন্দে শব্দ ঝঙ্কারের তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে।

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল

প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে বাংলাদেশে যে সকল কবিব উদ্ভব হইয়াছিল অক্ষয়কুমাব তাঁহাদেবই একজন।

নূতন আবির্ভূত হয় পুবাতনকেই অবলম্বন কবিয়া, তাই পুবাতনকে স্মবণ না কবিলে নবীন অভ্যুদয়কে আমরা সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে গ্রহণ কবিতে পাবি না, অক্ষয়কুমাবেব গীতিকাব্য আলোচনা কবিতে গিয়া সেই কথাই মনে হয়।

মানুষেব বসানুভূতি—মানুষেব আনন্দেব যাহা উৎসস্বরূপ তাহা সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে ও বিবিধ কলাশিল্পেব বচনায় রূপ পবিগ্রহ করিয়াছে। মানুষ সৌন্দর্য্যেব উপাসক, সেই সৌন্দর্য্যেব অনুভূতিব সাহায্যে সে যাহা গ্রহণ কবিতে সমর্থ হইয়াছে সেই অপরূপ ভাব-রাশি সে মূর্ত্ত্যরূপে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে ভাষায়, তুলিকায় ও শিল্প বচনায়।

নিজেব অন্তবের মাধুর্য্যেব আস্বাদ মানুষ পবিবেশন কবিতে চাহিয়াছে মানব সমাজে। নিজের্ব মনে যাহা লাভ কবিয়াছি তাহা নিজে উপভোগ করিয়া, মনের ভাণ্ডাবেই তাহা সঞ্চয় কবিয়া বাখিয়া আমার তৃপ্তি নাই, অপরকে সে অপূর্ব্ব আস্বাদনেব অংশী কবিতে না পাবিলে আমাব উপভোগেব আনন্দ পূর্ণতা লাভ কবে না, তাই ভাষাব সাহায্যে সেই অন্তবতম ভাবকে মূর্ত্তিদান কবিতে আমাব এত আকাঙ্খা। সাহিত্যেব প্রেরণায় ইহাই মূল কথা।

কবি ও সাহিত্যিক এইভাবে সাহিত্য বচনাব মধ্য দিয়া বিশ্ব-মানব-সমাজেব সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কবিয়াছেন। সাহিত্যের প্রাণ-ধর্ম্ম ভাব-বিতবণ, কিন্তু অপাত্রে বিতরণে তৃপ্তি নাই। দাতা উপযুক্ত গ্রহীতাকে দান করিয়া যে আনন্দ পান অপাত্রে দান করিয়া সে আনন্দ সে

তৃপ্তি পান না। বিশেষ করিয়া ভাব-রসের পরিবেশক এবং আস্বাদক উভয়েব ভিতব মরমী সম্বন্ধের দ্বারাই ভাবের পরিপুষ্টি হয়। কিন্তু কবিব কাব্যবসগ্রাহী শ্রোতা লাভের সৌভাগ্য যখন ঘটনাক্রমে সম্ভব হয় না তখন তাঁহাব যে মর্ম্মবেদনা তাহা এক অতীত কালের কবিব উক্তিতে এই ভাবে পবিস্ফুট দেখিতে পাই:

"ইতব তাপ শতানি বিতর, সহে চতুবানন,
অবসিকেষু বসস্য নিবেদনম্ শিবসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।"

হে চতুবানন, হে ভাগ্যবিধাতা, অপব শত শত তাপ আমাকে দাও আমি তাহা সহ্য কবিব, কিন্তু অবসিক জনেব নিকট বসেব নিবেদন রূপ দুর্ভাগ্য আমাব অদৃষ্টে লিখ না, লিখ না, লিখ না।"

তাই সাহিত্য-সাধনায় প্রতিভাবান ভাবুকেব প্রতিভা যেমন সাহিত্য-বিকাশেব উৎস স্বরূপ, সেই সঙ্গে অনুভূতি সম্পন্ন পাঠকেবও প্রয়োজন সেই উৎসকে অধিকতব বেগবতী কবিবাব জন্য। আপন-ভোলা কবি, তিনি বচনা কবিযা চলিযাছেন ভাবেব আবেগে, কিন্তু নিজেব বচনায় যে কত কি গূঢ় ভাব বহিয়াছে নিজেই হয়ত তাহা জানেন না, ভাবগ্রাহী পাঠক সেই বচনাব ভিতব এমন অনেক ভাব আবিষ্কাব করেন, যাহা বচনাকাবেব অজ্ঞাতেই স্ফূর্তিলাভ কবিয়াছে। তাই কোন এক কবি ও সমালোচক বলিয়াছেন:

"কবিতা-বসমাধুর্য্য কবি বেত্তি, ন তৎকৃতী,
ভবানী-ভ্রূকুটি-ভঙ্গী ভব বেত্তি, ন ভূধবঃ"।

অর্থাৎ কবিতাব-বস-মাধুর্য্য-অপব-মাধুর্য্য-আস্বাদন-বসিকজন যে ভাবে অনুভব কবিতে পাবেন স্বয়ং কাব্যকাবও তেমন পাবেন না,—যেমন ভবানীব ভ্রূকুটি ভঙ্গীব গূঢ় তাৎপর্য্য ভাবই অনুভব কবিতে পাবেন, গিবিবাজ হিমালয,—যিনি ভবানীব জন্মদাতা, তিনিও সে ভাবে অনুভব করিতে পাবেন না।

তাই দান ও গ্রহণে দাতা ও গৃহীতা উভয়েবই সমান মূল্য, সমান মূল্য

লেখক ও পাঠকগণের। এই ভাবেই সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। গড়িয়া উঠে পরস্পরের গুণমুগ্ধ কাব্য-রসিক দল, যাঁহারা পরস্পরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভাব-বিকাশের সাধনায় সতীর্থ হইয়াছেন।

অক্ষয়কুমারের গীতিকাব্যের আলোচনায় অতীত দিনের একটি ছবি মনের ভিতর জাগিয়া উঠে, বাংলা ১২৮৯ সাল ১৮৮২ খৃস্টাব্দ। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক; 'বঙ্গদর্শন' পূর্ণ গৌরবে পরিচালিত হইতেছে। সেই সময় অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'রজনীর মৃত্যু' 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

অক্ষয়কুমার ১৮৬০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং এই কবিতাটি যখন বাহির হয় তখন তিনি ২১ অথবা ২২ বৎসর বয়স্ক তরুণ যুবক। কলিকাতা চোরবাগান পল্লীতে শ্রীনাথ রায়ের গলিতে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। তাঁহাদের আদি নিবাস চন্দননগর, কিন্তু পরে তাঁহারা কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

সুবর্ণ-বণিক বংশে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। সুবর্ণ-বণিক বংশে অনেক ভগবৎ-ভক্তের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীপাদ প্রভু নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণ বণিক ছিলেন। অক্ষয়কুমারের পারিবারিক জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান এবং নিজেও ভগবদ্ বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন।

অক্ষয়কুমারের কাব্যচর্চ্চার গুরু ছিলেন কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়। 'কবিগুরু' এই আখ্যা তাঁহার পক্ষে সার্থক, কেননা তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও কাব্যচর্চ্চার গুরু ছিলেন। ভাবরসে মগ্ন এই বাণীর একনিষ্ঠ সাধক অন্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজের অনুভূতিতে নিজেই যেন ডুবিয়া থাকিতেন, তাই তাঁহার কাব্য সাধনা আত্মানুভূতির খাতেই প্রবাহিত হইয়াছিল।

দরিদ্র কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, সাহিত্য সাধন-তপস্যায় নিরত এক মহাতাপস,—মহাযোগী। তাঁহার গৃহ যেন একটি তপোবন, সেই তপোবনে

তাঁহার অনুরক্ত তরুণ শিষ্যদল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কাব্য সাধনায় দীক্ষা-লাভ কবিতেন। এই তপোবনেই অক্ষয়কুমাব বড়ালের সহিত রবীন্দ্রনাথেব পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। বডাল কবি তঁহাব 'ভুল' নামক গীতিকাব্য ববীন্দ্র-নাথকে উপহাব দিয়াছেন, এবং 'উপহাব' শীর্ষক কবিতায় সেই বালককালেব মধুব সম্বন্ধেব পবিচয় পাওয়া যায়। এখানে সেই কবিতাব প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করিতেছি:

"ববি,—

এই জগতের দূরে—
যেন কোন মেঘপুবে
তুমি আমি দুইজনে বেড়াতাম খেলিয়া,
হাতেতে দুলিছে বাঁশী,
ঠোঁটে উছলিছে হাসি,
চাবিদিক পানে চাহি চাবিদিক ভুলিয়া,
তুমি আমি দুইজনে বেড়াতাম খেলিয়া।"

কবি অক্ষয়কুমাবেব মনে কৈশোর কাল হইতেই মানব জীবনেব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগ্রত হইয়াছিল। তাঁহাব সাহিত্য সাধনাব গুরু বিহাবীলালেব নিকট তিনি জীবনপথেব প্রেবণাও পাইয়াছিলেন। তিনি বিহাবীলালেব মহাপ্রয়ানেব পবে সেই স্বর্গগত মহাত্মাব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবিয়া যে অপূর্ব্ব কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে এখানে সামান্য কিছু উদ্ধৃত কবিতেছি:

"বুঝায়েছ তুমি কত তুচ্ছ যশ,
কবিতা চিন্ময়ী চিব সুধাবস,
প্রেম কত ত্যাগী কত পরবশ,
নাবী কত মহীয়সী,
পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী।"

সাহিত্য সাধনার যে আদর্শ এই ছত্রগুলিতে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়, গুরুব জীবন যাপন প্রণালী হইতেই সেই আদর্শ বড়াল কবির অন্তরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, "কবিতা যে চিরসুধার সে পূর্ণ চিন্ময়ী মূর্ত্তিধাবিণী" প্রেম যে কি ত্যাগরূপ-তপস্যা, যশ যে কত তুচ্ছ, নারী কত মহীয়সী এই সকল উক্তিতেই সেই আদর্শের রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে আবও একটি কথা "ভাষা কিবা গবীয়সী"। শত শত সাধকেব সাধনার ধন এই বঙ্গভাষা, ইহাব পবিত্র ভাবেব প্লাবনে দশ দিক প্লাবিত ও মুগ্ধ, বড়াল কবি তাঁহাব কাব্যগুরুব কাব্য সাধনায় বঙ্গ-ভাষাব এই গৌরবও অনুভব কবিয়াছিলেন, তাই তিনি গুরুকে উদ্দেশ কবিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"বুঝায়েছ তুমি কিবা শ্রেয়ঃ ভবে
কি প্রেম-মত্ততা কবিত্ব-সৌরভে"

* * * *

"ধন, জন, মান যাব হয় হোক্
তুমি চিব-স্বপ্নে জাগি।"

মানুষ প্রাচুর্য্যেব পক্ষপাতী, কিন্তু দাবিদ্রেব ভিতর যে প্রাচুর্য্য সংগুপ্ত বহিয়াছে প্রেমরূপে ও ত্যাগরূপে, কয়জন তাহা অনুভব করিতে পাবে ?

অক্ষয়কুমার কাব্যগুরু বিহাবীলালের দেহান্তবের পর স্বর্গতঃ গুরুদেবকে যে কবিতার অর্ঘ্যদান কবেন তাহাব প্রথম স্তবকটি এইরূপ :

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীব,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি,
তবু কাঁদ কাঁদ, জনম ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি !

অক্ষয়কুমাব অনুভব করিয়াছিলেন 'সাহিত্য সাধনা ও দারিদ্র্য' এই দুটি যেন একে অন্যেব অনুবর্ত্তী। প্রিয় বন্ধু স্বর্গীয় নিত্যকৃষ্ণ বসুকে স্মরণ করিয়া ১৩০৭ সালে তিনি যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহাতেও দাবিদ্রের উল্লেখ আছে :

"হে নিত্য, অনিত্য সব সকলি দু'দিন।
সেই প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-করুণ অন্তব,
দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে চবিত্র সুন্দর,
স্বভাবে সবল অতি কর্ত্তব্যে প্রবীন,—"

১৩১০ সালে অক্ষয়কুমাব মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে ভক্তি অর্ঘ্য দান কবেন তাহাতেও দাবিদ্র্যের উল্লেখ আছে,

"হে কবি, হে পূজ্যকবি, চির দুখিনার
ভক্তিমান, কীর্ত্তিমান, কৃতজ্ঞ সন্তান!
অন্ধ নেত্র আজীবন ঢালি অশ্রুনীর
ক্রীতদাসী জননীব হেরি অসম্মান!"
"হে দরিদ্র, একদিন ক্ষোভে শোকে দুঃখে
আলোড়িলে জীবনের উদ্দেশ্য অতল!
হে জয়ন্ত তব যশোমুকুট-ময়ূখে
জটিল কর্ত্তব্য আজ সবল, উজ্জ্বল!"
"স্বর্ণ সিংহাসনে নৃপ দু'দিন জীবনে,
চিব প্রতিষ্ঠিত তুমি বঙ্গ-হৃদাসনে।"

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের জীবনী আলোচনায় বলিয়াছেন, "কবিতা দর্পণ মাত্র, তাহাব ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে।"

বড়াল কবিব গীতি কাব্য-দর্পণেব ভিতবে কবির যে ছাযা প্রতিবিম্বিত হইতে দেখি তাহাতে এক মহিমময় প্রেমের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছে ইহাই

অনুভূত হয়। তাঁহার বন্ধুপ্রেমের কথাই প্রথমে উল্লেখ করিব। কবির লোকান্তরের পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় যে অভিভাষণ দান করেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "কবি অক্ষয়কুমারের হৃদয়ে সহানুভূতি ভরা ছিল। তাঁহার সহানুভূতির গুণে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। যখন স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় বিশেষ বিপন্ন হইয়া অক্ষয়কুমারকে পত্র লিখিলেন, তখন তিনি এই দরিদ্র কবি-ভ্রাতার দুঃখে বিগলিত হইয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তিনি পরিচিত ও অপরিচিত বহু ব্যক্তিকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি ও বন্ধুবাৎসল্য অপূর্ব্ব। ভূতপূর্ব্ব 'কল্পনা' সম্পাদক সুলেখক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিবার পর তিনি তাঁহার শিশুপুত্র ও বিধবা পত্নীকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ন্যায় উদার হৃদয় কবিরই উপযুক্ত।"

তখনকার দিনের সাহিত্যগোষ্ঠী ছিলেন পরস্পর পরস্পরের নিতান্ত অন্তরঙ্গ, যেন এক একান্নভুক্ত পরিবার। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা ১২৯৬ সালে অর্থাৎ প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের গৃহ সাহিত্যিকগণের সম্মেলনের একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। অক্ষয়কুমার, সমাজপতি মহাশয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং সমাজপতি মহাশয় তাঁহার কবিতার একজন মুগ্ধ গুণগ্রাহী ছিলেন। বড়াল কবির অনেক কবিতা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। 'আবাহন' 'নায়িকার প্রতি কবি' ও 'বিদায়' এই তিনটি কবিতাই ১৩০০ সালের 'সাহিত্যে' বাহির হয়।

পরলোকগত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় সাংসারিক নানা বিপদ ও দারিদ্র্যপেষণে জর্জ্জরিত হইয়া নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার বহু কবিতা 'নব্য ভারতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পরলোকগতা পত্নী সারদাসুন্দরীকে 'প্রেম ও ফুল' নামক কবিতা গ্রন্থ উৎসর্গ করেন. উৎসর্গপত্রের প্রথম স্তবকটি এইরূপ ;—

"সাবদা হৃদয় রাণী প্রীতির প্রতিমাখানি
এসগো পূজিব আজি প্রেম ও ফুলে।
তব যোগ্য উপহাব ধরায় নাহি যে আব
পৃথিবীর সবি মাখা মাটি ও ধুলে।"

স্বর্গীয়া মহিলা কবি গিবীন্দ্রমোহিনী দাসীব 'অশ্রুকণা' নামক শোক কাব্যখানিও একই সময়ে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ সেটি ১২৯৫ অথবা ১২৯৬ সাল। অক্ষয়কুমাব এই কবিতাগুলি সাজাইয়া প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁহাব সাহিত্যিক বন্ধুগণের যখন যেভাবে পাবিয়াছেন সাহায্য কবিয়াছেন।

কবি বিহারীলাল নাবীকে 'মহিয়সী' বলিয়াছেন। বড়াল কবির প্রায় প্রত্যেক কবিতায় যেখানে 'নাবী' সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে এই 'মহিয়সী' রূপেই আমবা তাঁহাকে দেখিতে পাই।

কবি বিহাবীলালেব 'নাবীবন্দনা' চাবিটি মাত্র ছত্রে সরল বেখায় চিত্রিত একটি ছবি,

"প্রেমেব প্রতিমা, স্নেহেব সাগব,
করুণা নিঝর দয়াব নদী,
হ'ত মরুময় সব চবাচর
জগতে তুমি না থাকিতে যদি।"

কবি অক্ষয় বডাল তাঁহাব 'শঙ্খ' গীতিকাব্যে নাবীব হস্তেই 'হৃদয় শঙ্খ' তুলিয়া দিয়াছেন,

"হে বমণী লও তুলে লও,
তোমাদেব মঙ্গল উৎসবে,
একবাব এই গীতিগানে
বেজে উঠি সুমঙ্গল ববে।"

কবি বলিতেছেন :

"বিধাতার মহাকাব্য তুমি
সসীমে অসীমে সম্মিলনী।
ঘবে ঘরে কোটি যোগী কোটি কবি সিদ্ধকাম
তোমা মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনী।"

* * * *

তোমারি ও লাবণ্য ধারায়
কালেব মঙ্গল পবকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসাবে তুমি পূর্ণতাব দীপ্তি,
সান্ধ্যমেঘে স্বর্গের আভাস।"

অন্যত্র—স্তোত্র গানেব মত বন্দনা উচ্চাবণ কবিয়াছেন :

"তুমি শান্তি স্বস্তিদাত্রী, অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী,
সৃষ্টি কর্ত্রী, পালয়িত্রী ভবদুঃখ হবা।
আত্মমধ্যা স্বয়ংস্থিতা, সৌন্দর্য্যে অপরাজিতা,
মুগুধা, আশ্লেষরূপা বিশ্লেষ কাতবা।

কবিব বন্ধুপ্রেমেব ন্যায় তাঁহাব পত্নীপ্রেমও অতুলনীয়। তাঁহাব গৃহে অধিষ্টিতা গৃহলক্ষ্মী এবং তাঁহাব মানসী দুই যেন এক হইয়া গিয়াছেন তাঁহাব কবিতায় :

"এস প্রিয়া, প্রাণাধিকা,
জীবন হোমাগ্নি শিখা,
দিবসেব পাপ তাপ হোক্ হতমান।
ওই প্রেমে প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে, বাহু বন্ধে,
আবার জাগুক মনে আমি যে মহান্
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্ত, প্রধান।"

বড়াল কবির ‘কনকাঞ্জলী’ ও ‘ভুল গীতিকাব্য’ প্রধানতঃ প্রেমের কাব্য। প্রদীপ ও শঙ্খেও প্রেমের কবিতা আছে। প্রিয়তমার প্রেমই কবির আত্মানুভূতির প্রেরণা স্বরূপ।

“চিত্রে, শিল্পে, কাব্যে গানে
মগন তোমারি ধ্যানে,
তুচ্ছ করি কালের গরিমা।
পাষাণে পাষাণ রেখা,
তোমার প্রণয় লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা।

অন্যত্র,—

লয়ে প্রেম সুধারাশি,
এস দেবী, এস দাসী,
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয়া!
এস সুখে-দুঃখ দূরে,
জন্ম মৃত্যু ভেঙ্গে চুরে,
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ব্যাপিয়া।”

কবি বিহারীলালও প্রেমের গান গাহিয়াছেন অতি সহজ ও সরল ভাষায়। তাঁহার ‘সারদা-মঙ্গল’ এক অপূর্ব্ব প্রেম কাব্য। প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন:

“নয়ন অমৃত রাশি, প্রেয়সী আমার,
জীবন-জুড়ানো ধন, হৃদি ফুলহার।”

প্রিয়াকে ভালবাসিয়া কবি বিহারীলালের প্রাণের তৃপ্তি হয় নাই, তাই তিনি বলিয়াছেন,

“স্বভাবে অভাব আছে পুরাবো কেমন ক’রে,
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে।”

অক্ষয়কুমারের কবিতায় প্রেমের স্বরূপ নানা ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কখনও বা সে প্রেম পার্থিব জগতেব সীমা অতিক্রম কবিয়া অশেষেব পথে প্রয়াণ করিয়াছে। যে প্রেম,

"রাগ মানে বেঁচে বয়ে মবে' যায় তৃপ্ত হ'য়ে
বিবক্তি ভ্রূকুটি স'য়ে চুম্বনে মবণ।"

উপভোগেই যাহার পবিতৃপ্তি, উপভোগেব অবসানে যাহার অবসান, অক্ষয়কুমারেব প্রেম সে জাতীব প্রেম নয়। তাঁহার প্রেম জগদাতীত ভাবে উদ্‌ভাসিত, এমন এক অনুভূতি যাহা বর্ণনা কবিয়া বুঝান যায় না।

"প্রণয় জগদাতীত, যত দাও নহে প্রীত,
দাও, দাও, দাও সদা নাহি ধারা ক্রম।
"যত জ্যোৎস্না ঝবে পড়ে, তত চাঁদ শোভা ধরে,
বিলালে, ছড়ালে প্রেম কোটি গুণ বাড়ে।
নায়ক মশানে যায়, তবু প্রিয়া-গুণ গায়
মৃতদেহ পচে যায়, নায়িকা না ছাড়ে।"

প্রেম দুষ্প্রাপ্য নিধি,

"বহু স্বার্থ আত্মত্যাগে, বহু জপে, তপে, জাগে
বহু ধৃতি, ক্ষমা যত্নে প্রেম সমুদয়।"

এত দুষ্প্রাপ্য, এত সাধনাব ধন বলিয়াই তো তাহাব প্রতি এত আকর্ষণ! যাহা সহজপ্রাপ্য তাহা অতি শীঘ্রই পুবাতন হইয়া যায়, তাহাব প্রতি আব মানব মনের ঔৎসুক্য থাকে না।

"নীলাকাশ, শশী, ববি অতি পুবাতন ছবি,
বিস্ময়ে না হেবে আব মানব-নয়ন।
অন্ধকাব খনি-তলে ক্ষুদ্র মণি-কণা জ্বলে
ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া কবে দুষ্প্রাপ্য যতন।"

কিন্তু সকল সময়েই কি এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায়? সাধারণের মধ্যেই কি অসাধারণ ছদ্মবেশে থাকিয়া চিত্তাকর্ষণ করে না? এই প্রেম—এই প্রীতি—প্রতিদিনের দৃশ্যের মধ্যে, যাহা নিয়ত আমাদের নয়নগোচর হইতেছে সেই সকল পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটনা রাজির মধ্যে কি অপূর্ব্ব ভাবেই না ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে।

কবি মনোনেত্রে সেই সকল দৃশ্য দেখিয়াছেন যে দৃশ্য সকলেই শতবার দেখিয়াছেন। এক নবীন দম্পতি, একটি সুকুমার শিশু তাহাদের শয্যায় শায়িত। কবি স্বপ্নচৈতন্য প্রভাবে দেখিতেছেন প্রীতি যেন তাহাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে। কবি ডাকিয়া বলিতেছেন, "ওঠ, ওঠ, হে দম্পতি, কত পুণ্যের ফলে প্রীতি আজ তোমাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চেয়ে দেখ তোমাদের ওই শিশুটির দিকে,

"দেখ, দেখ, আঁখি ভরি,
কি স্বপনে মরি মরি
ঘুমায়ে ঘুমায়ে বাছা হাসিমুখে বাহু নাড়ে।"

আবার অন্যত্র প্রীতি আসিয়াছে শঙ্কিতা ভীতা এক নব বধূর বেশে শ্বশুর গৃহে। কবি গৃহের গৃহিনীকে ডাকিয়া বলিতেছেন,

"হে গৃহিনী দীপ আনি
দেখ - বধূ মুখ খানি,
ভালবেসে ভালবেসে পরে আপনার কর।

এই মূর্ত্তিমতী প্রীতি কবির গৃহে তাঁহার গৃহিনীরূপে বিরাজিতা। কবি যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

'এস প্রিয়া, এস দাসী।'

একধারে প্রিয়া, প্রাণাধিকা, উপাস্যা, আবার দাসী। কবির সংসার ছিল তাঁহারই প্রেম ও স্নেহ মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। সেই প্রাণাধিকাকে নিদারুণ নিয়তি হরণ করিয়া লইয়া গেল, রাখিয়া গেল কেবল স্মৃতি।

পত্নী বিয়োগের পর কবি 'এষা' নামে যে গীতিকাব্য বচনা করিয়াছিলেন বাংলা ভাষায় শোক কাব্যের মধ্যে তাহাব মত হৃদয়স্পর্শী কাব্য অতি দুর্লভ।

পত্নীকে স্মরণ করিয়া কবি যে গাথা গাহিয়াছেন তাহাতে যেন একটি জীবন্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, ফুটিয়া উঠিয়াছে বঙ্গগৃহের এক কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর মূর্ত্তি।

"কি ছিলে আমাব তুমি, প্রেয়সী কি ক্রীতদাসী,
দুটি হাতে সেবা ভবা, বুকে ভবা প্রেমরাশি!
একান্ত আশ্রিত-প্রাণা, নাহি নিজ সুখ দুঃখ,
সব আশা, সব সাধ আমাতেই জাগরুক।"

সেবার অপূর্ব্ব চিত্র:

আহাবে বসিলে বসি কাছে,
খাও, নাও, কেন পড়ে' আছে?
কত তৃপ্তি, কত ব্যাকুলতা।
নিশায় চবণ-সেবা কবি,
নিদ্রায় আনিত বলে ধবি,
প্রভাতে চরণে অবনতা।

বোগে জাগি দ্বিপ্রহব বাতে
শিয়রে বসিয়া পাখা হাতে,
নাহি নিদ্রা নিমেষ নয়নে।
স্বপ্নে যদি কভু কাঁদিয়াছি,
বলিয়াছে, 'এই আমি আছি'
দেহে ঘর্ম্ম মুছায়ে যতনে।"

আবাব, দেব সেবা পরায়ণা :

"সে অতি প্রত্যূষে উঠি, আসিত মন্দিবে ছুটি,
কবিত এ মন্দিব মার্জ্জনা,
তুলি ফুল গাঁথি মালা, সাজাত নৈবেদ্য ডালা
সচন্দন তুলসী অর্চ্চনা।"

* * *

"জানুপাতি কৈষেয়-বসনা,
স্থিব নেত্রে যুক্ত করে, ঝব ঝব অশ্রু ঝবে,
তোমা পানে চাহি এক মনা ,
পড়ে কিনা পড়ে শ্বাস, সিক্ত মুক্ত কেশবাশ
শিথিল অঞ্চলা, স্মিতাননা।"

"আবাব সন্ধ্যায় হেথা আসি,
দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া প্রণমিয়া
ফুবাত না তাব ভক্তি বাশি।"

অক্ষয়কুমার বৈষ্ণব পবিবাবেব সন্তান, গৃহে বিগ্রহেব সেবা হইত। কবি নিজেও যে ভগবদভক্ত ছিলেন তাহা তাঁহাব বচনায় সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পত্নীবিয়োগের পব দেবমন্দিবে গিয়া তিনি গৃহদেবতাকে অনুযোগ কবিয়া বলিয়াছেন, "নিষ্ঠুব দেবতা, তোমাব পূজাবিণীকে অকালে হবণ কবিয়া তোমার কি লাভ হইল ? কে আব এখন তোমাব সেইরূপ একান্ত ভক্তিভবে অর্চ্চনা কবিবে ?"

১৩১৩ সাল ১৯শে মাঘ কবিব পত্নী বিয়োগেব স্মবণীয় দিন। এ কাব্যেব প্রথমেই সেই দিনটি মুদ্রিত কবা হইয়াছে। আসন্ন মৃত্যুব উপস্থিতি অনুভব কবিয়া মৃত্যুপথযাত্রিনী কবে জপ কবিতেছেন, বালিকা কন্যা পিতাকে প্রশ্ন করিতেছে :

"বাবা,

মা কেন এত   কর জপে আজ

করে এত ঠাকুর প্রণাম ?"

উত্তরে পিতা বলিতেছেন,

"কাছে যা বাছাবে,   শুনাগে তাঁহারে

জনমের মত হরি নাম।"

কবি নিজে তখন ভগবানেব কাছে কতই আকুল প্রার্থনা করিয়াছেন কিন্তু সে প্রার্থনা বিফল হইয়াছে। তাই পত্নীর পবলোক গমনেব পব মন্দিবে গিয়া বিগ্রহকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

"হে বিগ্রহ পাষাণ হৃদয়,

চিরদিন লক্ষ্মীসনে   বিরাজিছ সিংহাসনে,

ভাবিতেছ বিশ্বেব বারতা।

কাংশু, ঘণ্টা, শঙ্খরোলে   তবু না শ্রবণ খোলে,

পশে না নবের ক্ষুদ্র কথা"

এই অভিমান সরল হৃদয় ভক্তেব অভিমান।

নিপুণ তুলিকায় কবি মৃত্যুব চিত্র ও মৃত্যুব পব পারিবাবিক চিত্র অঙ্কিত কবিয়াছেন। আসন্ন-মৃত্যু জননীব সন্তানেব সংবাদ পাইবার জন্য তখনও কি ব্যাকুলতা।

পত্র আসিয়াছে, কিন্তু সেখানি পুত্রেব নিকট হইতে নয়, অন্য কাহাবও নিকট হইতে আসিয়াছে।

"অময়ের চিঠি ? ভাল আছে ?"

মুমূর্ষু জিজ্ঞাসে।

অশ্রুভবা কাতর নয়নে

একদৃষ্টে চায়,

নাহি শ্বাস, হৃদয়ে কম্পন

উত্তর আশায়।"

অক্ষয়কুমাব দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবিয়া মিথ্যা উত্তর দিলেন ; বলিলেন, "ভাল আছে, তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে, পড়াশুনা করছে।"

এই উত্তবটি শুনিবার জন্যই যেন মৃত্যুপথ যাত্রিনীব জীবন তখনও অপেক্ষা কবিতেছিল :

"শান্ত, তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্ব ফিবে
কবিল শয়ন ,
ফুবালো জীবন !"

নীবব বিদায়। বডাল কবি যেন বুঝিতেই পারিতেছেন না কি হইয়াছে।

"মৃত্যু ? এত দ্রুত ? এমন সহসা ?"
চিবতবে ছাডাছাড়ি, দেহে প্রাণে কাডাকাডি,
নাই তার কোন আয়োজন ?
বলিবে না কোন কথা ? জানাবে না কোন ব্যথা ?
ফিবাবে না বাবেক নয়ন ?"

সত্যই কি এই মৃত্যু ? না ইহা স্বপ্ন ? প্রিয়তমাব উদ্দেশে কবি বলিতেছেন, "আমি তো একবাবও ভাবি নাই যে, তুমি আমাকে ভুলিয়া মবিতে পাব। একি সত্য, না তোমাব ছলনা ?"

"বুঝিতে যে চাহে না হৃদয়,
বলিতে সোহাগে বাগে মবিবে আমাব আগে
এ যেন তাহারি অভিনয় ?"

"এই যে এখনও মুখে হাসিব বেখা দেখা যাইতেছে, ঠোঁট দু'খানি যেন কথা বলি বলি কবিতেছে।"

জননীকে সম্বোধন কবিয়া পাগলেন মত অক্ষয়কুমাব বলিতেছেন, "মা, মা ওই দেখ যেন একটু একটু নিশ্বাস পডছে, তুমি আব কেঁদ না। ওই দেখ একটু যেন নডে উঠল। মা, জানলা দবজা সব খুলে দাও, আব তোমাব

পায়ের ধূলা ওর মাথায় দাও। বেঁচে উঠবে, মা, তোমার আশীর্ব্বাদে বেঁচে উঠবে।"

ভগবানকে আর্ত্তস্বরে ডাকিতেছেন, "দয়াময়, বাঁচাও, বাঁচাও।"

আবার মৃতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

"মেল আঁখি সর্ব্বস্ব আমার ?
ম'রোনা ম'রোনা প্রিয়ে, একমাত্র তোমা নিয়ে
আমার এ সাজানো সংসার।
চেষ্টা করি প্রাণেশ্বরী নয়—তবে দয়া করি
নিঃশ্বাস ফেল গো একবার।"

মনে উঠিতেছে বিলয় হইতেছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, "মৃত্যু কি ? মরণে কি প্রেমেরও মৃত্যু হয় ? চিতানল এই সুন্দর দেহকে ভস্মে পরিণত করিবে সেই সঙ্গে প্রাণও কি দগ্ধ করিবে ? রহিবে না কোনই অনুভূতি ? এই ছিল— আর নাই, ইহাও কি সম্ভব ? প্রতি দিনে প্রতি পলে পলে যে একান্ত পরিচিতা সে কি এমন অপরিচিতার মত একেবারে অন্তর্হিতা হইতে পারে ?"

সেই সঙ্গে অভিমানও আসিতেছে মনে, "আগে কেন আমাকে জানিতে দাও নাই ? বল নাই কেন যে তুমি এক স্বর্গভ্রষ্টা দেবী, অভিশাপে মানবী-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছ, অভিশাপ মুক্তি হইলেই চলিয়া যাইবে। এত যে দুঃখ দিবে আভাসেও কেন তাহা জানাও নাই।"

প্রিয়জনের বিরহে বিরহীর এই শোক, এক সার্ব্বজনীন অনুভূতি। তাই আমরা দেখিতে পাই পত্নী-বিয়োগ-বিধুর কবি অক্ষয়কুমারের 'এষা' কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যের ভাবগত ঐক্য। পরলোকগতা প্রিয়তমা পত্নীকে স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'স্মরণ' রচনা করেন।

স্মরণের একটি কবিতা :

"তখন নিশীথ রাত্রি। গেলে ঘর হ'তে
যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে।

যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায় বারতা
সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব মাঝে বাহিরিলে একা—”

এষায় “পিতা নাই, মাতা নাই, পতি পুত্র নাই,
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে কোথা ফিরে কোথা ফিরে
অনলে, অনিলে, শূন্যে, কোথায় কোথায়।

স্মরণের “গেলে যদি, একেবারে গেলে শূন্য হাতে,
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে?
বিশ বৎসরের তব সুখ দুঃখ ভার,
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার।

এষায় “হও নাই কোন দিন গৃহের বাহির,
আজ তুমি কোথা যাবে? কার মুখপানে চা'বে?
সুখে দুঃখে হইলে অস্থির?
অচেনা অজানা ঠাঁই, কেহ আপনার নাই—
কে মুছাবে নয়নের নীর?
কোমলা সরলা অতি, পতি গতি, পতি মতি,
কে বুঝিবে মর্য্যাদা সতীর?

দুই যুগ জানাজানি আজ কিসে মিথ্যা মানি
দুই দেহে এক প্রাণ মন।

সেই একই ক্রন্দন,—
“আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই!” (স্মরণ)

আবাব সেই একই পরিতাপ :

"মন খুলে' প্রাণ খুলে তাবে
বলি নাই কেন বারে বারে,
ভালবাসি—বড ভালবাসি ?"

(এষা)

"সে যখন বেঁচেছিলগো তখন
যা দিয়েছে বাব বাব,—
তাব প্রতিদান দিব যে এখন
সে সময় নাহি আর।

(স্মবণ)

'এষা'য় শ্মশান দৃশ্য ও পাবিবাবিক শোকের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে, নিপুণ শিল্পীব অঙ্কিত সজীব চিত্রেব ন্যায়। হিন্দুগৃহে আছে অশৌচ গ্রহণ ও শ্রাদ্ধাদি, এগুলিব তাৎপর্য্য শোকপ্রকাশ ও মৃতেব প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

গৃহ শূন্য করিয়া গৃহলক্ষ্মী গিয়াছেন লোকান্তরে, মাতৃহীন পুত্র কন্যাগুলি ঘবেব মেঝেয় বসিয়া আছে মণ্ডলী কবিযা কম্বলেব উপবে।

"নব বস্ত্র পরিহিত, বাক্যহীন, সঙ্কুচিত,
ম্লান মুখ, রুক্ষ কেশ, নেত্র ছল ছল!

*　　*　　*

মধ্যে বসি ক্ষুদ্র শিশু কিছু নাহি জানে
কেন যে এমন,
দেখে বস্ত্র আপনার, দেখে মুখ সবাকাব
দেখে দ্বাবপানে চাহি কাতর নয়ন।"

কবিব জননী প্রাঙ্গনে ধূলায় লুন্ঠিতা হইয়া কাঁদিতেছেন, ভগিনী জননীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেও কাঁদিয়া উঠিতেছে, দাসী হাহাকাব কবিয়া কাঁদিতেছে, পোষা বিড়ালিটি এঘর ওঘব ঘুরিয়া 'মিউ মিউ' কবিয়া কাঁদিতেছে।

শোক কেবল বিয়োগ বেদনার অনুভূতিই নয়, শোকের ভিতর আছে জীবন ও মৃত্যুর সমস্যা-সমাধানের নানা দার্শনিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলি যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় উঠিয়াছে ও ডুবিয়াছে কবি-মানসে, 'এষা' কাব্যের ইহাই প্রধান বিশেষত্ব।

দারুণ শোকেও কবি ভগবানের উপর বিশ্বাস হারান নাই। স্বর্গ কল্পনা ও পরলোক কল্পনা শোকাহত চিত্তের আত্মতৃপ্তি সাধন। গ্রন্থ শেষে আমরা দেখি কবি বৈকুণ্ঠের স্বপ্নদর্শন করিতেছেন :

"কি স্বপন সুমধুর!
দূর-দূর—অতি দূর
বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে স্বর্ণ অলিন্দায়
দিয়া ভর, একাকিনী
দাঁড়াইয়া বিষাদিনী
হেরিছে কাতর নেত্রে ধরিত্রী কোথায়?"

বৈকুণ্ঠলোকে গিয়াও কবির প্রিয়তমা কাতর নেত্রে ধরিত্রীরই অন্বেষণ করিতেছেন।

'এষা'র সর্ব্বশেষ কবিতায় আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আশ্বাসের সুর ধ্বনিত হইয়াছে :

"ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময়!
মরণে নহি তো ভিন্ন,
প্রেমসূত্র নহে ছিন্ন,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অব্যয়।

* * * *

ক্ষম এ ক্রন্দনগীতি—শোক-অবসাদ,
সে ছিল তোমারি ছায়া,
তোমারি প্রেমের মায়া!
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ।

এখনো সে যুক্ত করে,
মাগিছে আমার তরে
তোমার চরণতলে শুভ আশীর্ব্বাদ।

এখানে রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' হইতেও অনুরূপ ভাবের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :

"আজি বিশ্ব-দেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।

*　　　　*　　　　*

একান্তে বসিয়া আজ করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হোক্ তোমার কল্যাণ।"

কবি প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সায়াহ্নে ও প্রদোষে এবং নিশীথে নামে কালের বিভিন্ন রূপের অভিব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া যে কবিতাগুচ্ছ রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে 'নিশীথ' কবিতার শেষ স্তবক হইতে এখানে দুইটি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

"দাঁড়াও, অভেদ আত্মা, পরলোক বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যু কুহেলিকা ধূমে।

কবির পত্নীপ্রেম তাঁহার রচনায় যেমন জীবন্ত রূপ ধারণ করিয়াছে সেইরূপ বাৎসল্যের চিত্র অঙ্কনেও বড়াল কবির নিপুণতার তুলনা নাই। 'অময়ের যাত্রা' নামে একটি কবিতা তাঁহার পত্নীর জীবিতকালে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'নব্য ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল পরে সেইটিই 'শঙ্খ' গীতিকাব্যে অল্প কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া 'পূজার পর' নামে প্রকাশিত হয়। 'অময়' কবির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম।

অময়ের যাত্রা।

কোন মতে ভাঙা ঢোল করি আহরণ
সন্ধ্যায় আহার-অন্তে বীরমদে মাতি,
অময় লইয়া লাঠি ফুলাইয়া ছাতি—

খুকীরে গর্জ্জিয়া বলে "ওরে দুরাত্মন !"
ভীরু কন্যা বলে, "দাদা, নাহি চাহি রণ ,
ভয়ে শুষ্ক মুখে বসে ভূমে জানুপাতি,
তথাপি নিস্তার নাই, ভূমে মারে লাথি,
বলে, "মোর হস্তে তোর নিশ্চয় নিধন।"
না হেরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী মত্ত রণোন্মাদে
দ্বারে শত্রু অনুমানি করে মুষ্ট্যাঘাত,
আচম্বিতে করপদ্মে হেরি রক্তপাত
বীর-সহ সৈন্যগন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে :
গৃহিনী দিলেন আসি ঘা কত অবাধে,
ব্যথায় ফোঁপায় বাছা শুয়ে সারারাত।

বঙ্গাল কবির 'মাণিক' কবিতার রবীন্দ্রনাথের শিশুর 'ছোট বড়' কবিতার সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

পাঁচ বছরের ছেলে মাণিক তাহার মাসীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "হ্যাগা মাসী, আর ক বছর পরে আমি বড় হ'ব ?"

"বড় হ'লে দেখো তুমি আমি ও মহিম,
দু'জনে ঘোরাবো শুধু সোনার লাটিম।"

* * * *

"বই ছিঁড়ি, কালি ফেলি, হারাই পেন্সিল,
মারবে না দাদা আর 'ঘাড় ধরে' কিল।"

আবার—

"খাই আর নাই খাই, বড় হ'লে মা
জোর করে' ঘাড় ধরে ভাত খাওয়াবে না।"

মাণিকের শুচিবাইগ্রস্থা পিসিমা বিড়াল দেখিলেই তাড়াইয়া দেন, কিন্তু মাণিক বিড়াল ভালবাসে, তাই দম্ভভবে বলিতেছে,—

"বড হ'লে দেখে নিও পিসিমা কেমন
মেনিবে তাডায় বেগে যখন তখন।
বাবাব সোনাব সেই বড চেন দিয়ে
মেনিবে ঠাকুব ঘবে বাখিব বাঁধিয়ে।"

'কন্যাব বিবাহ' নামক কবিতায় দেখিতে পাই কন্যাটিব বযসমাত্র দশ বৎসব পূর্ণ হইযাছে। সেই বালিকা পিতৃগৃহ ছাড়িয়া চলিয়াছে শ্বশুব বাড়ি। সঙ্গিনীগণেব সহিত ছেলে খেলা, মাযেব আদব, পিতাব স্নেহ ভাইবোনে বিবাদ-মিলনেব ভিতব যে আনন্দ, সকলই বহিল পিছনে পড়িয়া। এ- স্নেহেব পুত্তলীকে বিদায দিতে পিতা মাতাব কী মর্ম্মবেদনা:

"দেছি পূর্ণ দশবর্ষ, স্নেহ, যত্ন, সুখ হর্ষ,
আদব সোহাগ।"

'শিশুহাবা' মাতৃহীন' 'মাতৃহীনা' প্রভৃতি কবিতাগুলিও বাৎসল্য ব- অভিষিক্ত। ছেলেব আদবে:

"বড দুষ্ট, না না যাদু অতি শিষ্ট তুমি,
আব ফুলাওনা ঠোঁট এই মুখ চুমি।
তোমাবে বকিতে পাবে হেন সাধ্য কাব,
সসাগবা ধবিত্রীব সম্রাট আমাব!
ছাড্ ছাড্ লক্ষীছাড়া, গোঁফগুলো গেল,
এই লও বাঙ্গা লাঠি বসে' বসে খেল।"

বড়াল কবিব কাব্যে সর্ব্বত্রই দার্শনিকেব আত্ম-জিজ্ঞাসা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রেমিক কবি প্রেমকেও যাচাই কবিয়া লইতে চাহিয়াছেন,

"ভালবাসা ভালবাসা এ শুধু কথাব কথা?
কবিব কল্পনা?"

যৌবনের প্রেমকে তিনি বাল্যকালের সরল ভালবাসার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন, একবার তাঁহার মনে হইয়াছে শৈশবের প্রেমই বুঝি পবিত্র ও সুমধুর ছিল, সেই সঙ্গে মনে হইয়াছে,

"যৌবনে বুঝিনি যাহা, শৈশবে তা বুঝেছিনু
হয় না প্রত্যয়।"

কবি নিজের রচনার ভিতরেও পরিতৃপ্তি পাইতেছেন না। যে গভীর ভাবকে তিনি ভাষায় ফুটাইতে চাহেন তাহা যেন ফুটিতেছে না:

"এ কি শুধু ভাবহীন ভাষা?
এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত পিপাসা।"

তাঁহার এই অতৃপ্তি তাঁহার প্রথম গীতিকাব্যের উপহার পৃষ্ঠায় এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে কয়েকটি ছত্রে:

"গীত অবশেষে নিশ্বসিল কবি,
বল কি গাহিব আর—
মরমের গান ফুটিল না ভাষে
বাজিল না হৃদিতার।"

তবু তিনি এই গীতি কবিতাকে ভালবাসেন, ছোট ছোট ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে তিনি ভালবাসেন, কবি অনুভব করিয়াছেন ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়াই বিরাটের প্রকাশ। ক্ষুদ্র বৃষ্টিকণাই একত্র হইয়া সপ্তসমুদ্র গঠন করিয়াছে,—ক্ষুদ্র বালুকণা গঠন করিয়াছে বিশাল মহাদেশ ও উচ্চশির পর্ব্বতরাজি। তাঁহার 'মানব বন্দনা' নামক কবিতায় মানব সমাজ গঠনের ইতিহাসের মূল কথায় তিনি তাই বলিয়াছেন:

"নমি আমি প্রতিজনে আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস,
সিন্ধুমূলে জল বিন্দু বিশ্বমূলে অনু,
সমগ্রে প্রকাশ।"

-বড়াল কবির 'মানব বন্দনা' একটি অপূর্ব্ব কবিতা। ডারউইন মানুষ কি ভাবে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে উন্নীত হইল তাহার যেন একটি মানচিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহার ক্রমবিকাশবাদে। বড়াল কবিও অঙ্কন করিয়াছেন মানব বিকাশের সেই আদিযুগ :

"ধরিত্রী অরণ্যে ভরা কর্দ্দমে পিচ্ছিল,
সলিলে শিশিরে।
শাখায় ঝাপটি পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল,
সম্মুখে শ্বাপদসঙ্ঘ বদন ব্যাদানি
আছাড়ে লাঙ্গুল।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর অসহায় আদিম মানব। পশু জীবন হইতে সে এখন উন্নত জীবনের অধিকারী হইয়াছে বটে কিন্তু একেবারেই সে অসহায়। শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার মত তাহার কোন দৈহিক অস্ত্রই নাই যাহা পশুজীবনে ছিল। তাহার তীক্ষ্ণ দন্ত বা নখর নাই, শত্রুর হাত হইতে পলায়ন করিয়া বাঁচিবার মত দ্রুতগতিও তাহার নাই। শত্রুতে পরিপূর্ণ বাসভূমিই তাহার আবাস স্থল, অথচ আত্মরক্ষা করিবার মত নিরাপদ আশ্রয় স্থানও তাহার নাই।

আকৃতিতে সে কদাকার, কিন্তু পশুর ন্যায় দীর্ঘ রোম বা পক্ষীর পালকের ন্যায় অঙ্গাবরণ এখন আর তাহার দেহ রক্ষা করিতেছে না। ভাষাও তাহার আয়ত্ত হয় নাই, মনও বিকাশ লাভ করে নাই। কিন্তু তবুও তাহার মনে হয়ত একটা অস্পষ্ট অনুভূতি জাগ্রত হইয়াছিল যে, রক্ষা কর্ত্তা একজন আছেন।

"সেই আদিযুগে যবে শিশু অসহায
নেত্র মেলি' ভবে,
চাহিয়া আকাশ পানে কারে ডেকেছিল
দেবে না মানবে?"

*　　*　　*

সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকাবে,—মরুত-গর্জ্জনে
কাব অন্বেষণ ?
সে নহে বন্দনা-গীতি,— ভযার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজি‚হ স্বজন ।”

এই একান্ত অসহায় অবস্থা হইতে মানুষ কি ভাবে নিজেব চেষ্টায় আত্মবক্ষাব উপায় নির্দ্ধাবণ কবিয়া লইয়াছে, কি ভাবে সোপানে সোপানে পদক্ষেপ কবিয়া উন্নততব জীবনেব পথে অগ্রসব হইয়াছে ‘মানববন্দনা’ কবিতায় বড়াল কবি তাহা জীবন্ত চিত্রেব ন্যায আঁকিযাছেন। বন্দনা কবিয়াছেন তিনি সেই মানবকে, গৃহহীন,আশ্রযহীন যে মানব নিজেব চেষ্টায গৃহনির্ম্মাণে পটু হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ নগব, প্রাসাদ ও বিবাট-সৌধ প্রভৃতি ও নির্ম্মাণ কবিয়াছে। যে মানব আবণ্যজীবন হইতে শিক্ষা ও সভ্যতাব সমুজ্জ্বল জীবনপথে প্রবেশ করিয়াছে, কদাকাব দেহ হইতে সুশ্রী শ্রীমান দেহসম্পদেব অধিকাবী হইয়াছে।

“নমি হে সার্থককাম! স্বরূপ তোমাব
নিত্য অভিনব।
মব দেহে নহ মব, অমব অধিক
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য তব।

*　　*　　*　　*

গড়িলে আপন মূর্ত্তি　　দেবতালাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায়,
গড়িছ, ভাঙ্গিছ তর্কে　　দর্শনে বিজ্ঞানে
আপন শ্রষ্টায়।”

'অগ্রসর, অগ্রসর' মানবজীবনে জীবন পথের ইহাই জয়ধ্বনি।

"নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ক্লান্তি, ভয়,
কোথায়—কোথায়!
চিরদিন এক লক্ষ্য, জীবন বিকাশ,
পরিপূর্ণতায়!

গড়িয়া উঠিল মহান্ মানব সমাজ, বড় বড় সাম্রাজ্য, শিল্পকর্ম্মে বিভূষিত দেবায়তন, সেতু, পরিখা প্রভৃতি। কিন্তু—এ গঠনকার্য্যে কাহারা ভারবাহী হইয়া দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়া নীরবে কর্ম্ম সাধন করিয়া চলিয়াছে? কাহারা নিজ পরিশ্রমজাত আহার্য্য ও বস্ত্র দিয়া সমস্ত সমাজকে পোষণ করিতেছে? কবি তাহাদেরও বন্দনা করিয়াছেন:

"নমি কৃষি, তন্তুজীবি, শ্রমিক, তক্ষণ,
কর্ম্ম, চর্ম্মকার,
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড দৃষ্টি অগোচরে
বহ অদ্রিভার।"

প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিয়াছে—মানুষ, কিন্তু তবু কি মানুষ জীবনের প্রকৃত পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিয়াছে?—মানুষের শক্তি ও ক্ষমতার সীমা নাই,—মানুষ অসাধ্য সাধনে সক্ষম। মানুষের কৃতিত্বের গর্ব্বে গর্ব্বিত কবি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।"

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মানবজাতি, কবি বলিয়াছেন একদিক দিয়া সে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানেরই সমতুল্য,

"কল্পনার কুতূহলী,
দর্শনে বিজ্ঞানে বলী,
সৃষ্টি সংস্কারী।"

তার সাধনা, যত্ন ও পরিশ্রম,—তার ধৈর্য্য, শক্তি, নিরন্তর অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায় ইহার পরিমান হয় না, কিন্তু সমস্ত—সমস্তই ব্যর্থ, 'প্রেম' যদি এই সাধনার অধিষ্ঠাত্রীরূপে আবির্ভূত না হন। সর্ব্বক্ষেত্রে জয়ী মানব কেন অসুখী, কেন সকল সফলতার ভিতর সে জীবনকে বিফল বলিয়া মনে করিতেছে?

"এত গর্ব্ব, এত জয়,
তবু নর সুস্থ নয়,
তবু উঠে হাহাকার ভেদি অন্তঃস্থল,—
গেল—গেল জীবন বিফল।

'প্রেম' যদি না থাকে তবে সমস্তই অনার্থক। আত্মপরায়ণ জনের জীবনে সার্থকতা কোথায়?

বৃথা তার ইতিহাস,
ভবিষৎ, কাব্যভাষ,
বৃথা যুগ-বিবর্ত্তন,
মিছা কুরুক্ষেত্র রণ,
সভ্যতার এত শ্রম বৃথায়—বৃথায়!
ধিক্ নরে, নর প্রতিভায়!

মানুষের এক দিকে—আত্মবিস্কার, আবার অপর দিকে অহঙ্কার। মানুষ নিজেকে যতই উন্নত মনে করুক এখনও কি সে সেই পশুজীবনের সম্পূর্ণ উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে? সেই কাম, ক্রোধ ও লোভ, পরকে বঞ্চিত করিয়া আত্ম পোষণের প্রয়াস সেতো পশুরই ধর্ম্ম।

আজো সেই পশুধর্ম্মে
ভ্রমে লক্ষ্যহীন কর্ম্মে,
আত্ম-প্রতিষ্ঠার ছলে
বিশ্ব দেয় রসাতলে,
কামে, ক্রোধে, লোভে, মদে সৃষ্টি শত চুর!
হা, হা, নর সাক্ষাৎ অসুর!

কিন্তু তবুও মানব শ্রেষ্ঠ, কেননা সে হৃদয়বান। মানবহৃদয়ই প্রেমের যোগ্য আসন, এবং এই আসনে অধিষ্ঠিতা হইলেই প্রেমের প্রকৃত সার্থকতা। তাই কবি প্রেমকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন :

"এস তবে এস ভবে
সত্যই কৃতার্থ হবে,
এ বিকচ তনু মন
বিধাতার ধ্যেয় ধন,
দেবাসুর রণক্ষেত্র, সর্ব্বতীর্থ সার,
উপযুক্ত আসন তোমার !

'আবাহন' কবিতা প্রেমের আহ্বান মন্ত্র। মানুষের জীবনের যুগে যুগে সঞ্চিত যত কিছু সাধনা সমস্ত যেন সার্থক হয় প্রেমের অধিষ্ঠানে, ইহাই কবির একান্ত কামনা।

"একত্র করেছি আজি
যুগ যুগ চিন্তারাজি,
হে পীরিতি, স্ব মুরতি কর অধিষ্ঠান,
লহ অর্ঘ্য, রাখ নবমান।"

উর শত সূর্য্যভাসে,
নীচতা পলাক ত্রাসে,
জ্বলে যাক্ অহঙ্কার,
ধন জন হুহুঙ্কার,
হিংসা, দ্বেষ, অত্যাচার, মিথ্যা কোলাহল,
মঙ্গলে মরুক অমঙ্গল।

এস ভেদি ব্রহ্মরন্ধ্র

হে আনন্দ, ভূমানন্দ!

উৎপাটিয়া মর্ম্মস্থল

সদ্য রক্তে ঝলমল

এস আত্ম বিনাশিনী পরার্থ জীবিতে,

সত্য শিবে সৌন্দর্য্য-সম্মিতে !!" (প্রদীপ ৪৩ পৃঃ)

মানব মনের একমাত্র চিরন্তন প্রশ্ন, এ জীবন কেন? জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্ন লইয়া চিরকাল মানুষ সমাধানের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়া ভগবানের শরণ লইয়াছে।

ভগবানে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে তাঁহারা এইভাবে সংসার সংগ্রামে পীড়িত হইয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া শান্তি লাভ করেন। আবার যাঁহারা আদর্শের পূজা করেন তাঁহারা সেই আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের মধ্যে একটি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। এক্ষেত্রে আদর্শে ও ভগবানে কোন পার্থক্যই নাই।

বড়াল কবি ভগবদ্-বিশ্বাসী, পিতৃ নির্ভর পরায়ণ পুত্রের ন্যায় তাঁহার ভগবানে একান্ত নির্ভর।

"কোথা হে জগৎ পিতা, ডাকি হে তোমারে

দলিত মথিত আমি সংসার-সমরে।"

আর্ত্ত হইয়া তিনি প্রার্থনা জানাইয়াছেন :

"অন্ধ যথা খর জ্ঞানে অনুভবে অনুমানে

গন্তব্য আপন,

নাহি সে অন্তর দৃষ্টি বুঝি না তোমার সৃষ্টি

জীবন মরণ!"

কোথা তুমি জীবন-জীবন !

আত্মদ্রোহী, আত্মঘাতী ডাকে তোমা জানু পাতি,

কর তারে কৃপা বিতরণ,

বল তারে বল এসে, কোন্ পথে চলিবে সে,

কি উদ্দেশ্য করিবে সাধন ?

অন্ধের দৃষ্টি নাই কিন্তু এমন এক অনুভূতি আছে যে অনুভূতির সাহায্যে সে নিজের গন্তব্য পথ নির্ণয় করে, বধির ওষ্ঠ কম্পন দেখিয়া সেই ইঙ্গিতে বক্তব্য বুঝিয়া লইতে পারে, এমন কি নিম্নপ্রাণী পশুরাও আঘ্রাণের সাহায্যে ভাল ও মন্দ বুঝিয়া লয়,—

কিন্তু,

বুদ্ধি লয়ে নর—

প্রতি চিন্তা, প্রতি কর্ম্মে, কি পরীক্ষা ধর্ম্মাধর্ম্মে

সহে নিরন্তর !

কোন্‌টি ধর্ম্ম কোন্‌টি অধর্ম্ম মানুষের বুদ্ধি নির্ণয় করিতে গিয়া পদে পদে ভ্রান্ত হয়। অন্তর্দৃষ্টি যাহার আছে সেই তো জীবনের আদর্শ নির্ণয় করিয়া লইতে পারে।

"নাহি সে অন্তর দৃষ্টি, বুঝি না তোমার সৃষ্টি

জীবন মরণ।

কেন সুখ দুঃখ সাথ তোমার ইঙ্গিত নাথ

নাহি বুঝে মন।"

কবি তাই ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

শত আশা ভাষা নিয়া মূক পুত্র আকুলিয়া

কাঁদে উভরায়,

তুমি পিতা স্নেহে দুখে আদরে না নিলে বুকে

কি তার উপায় !

হে পিতা, তোমাকে নানা জন নানাভাবে অনুভব করে, দুঃখী যখন দুঃখের ভিতর তোমার মঙ্গল হস্ত দেখিতে না পায় তখন তোমার উপর বিশ্বাস হারায়, আবার সুখী আত্মসুখে মগ্ন হইয়া অহমিকায় কোন কিছুই গ্রাহ্য করে না। এইরূপ জ্ঞানী, ভক্ত, ঋষি প্রভৃতি সকলেই বিভিন্নভাবে তোমাকে কল্পনা করে।

"দুঃখী বলে 'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা,
চক্র সম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে,—"কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায়?
ধরণী নরের পদতলে।
জ্ঞানী বলে,—'কার্য্য আছে, কারণ দুজ্ঞেয়,
এ জীবন প্রতীক্ষাকাতর।'
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহাবাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক শেখর।'
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান্'
কবি বলে 'তুমি শোভাময়!'
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে
দয়াময়, হও হে সদয়!'
সমস্যাময় এই মানবজীবন,
"আছে দেহ আছে ক্ষুধা,
আছে হৃদি খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু চাহি অমরতা।"

জন্মের সঙ্গে যেন মৃত্যু গ্রথিত হইয়া আছে, মৃত্যুই জীবনের অমোঘ পরিণাম, কিন্তু তবু মানুষ অমরত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল।

ভয়ঙ্কর এই মৃত্যু, মৃত্যুর চিন্তাও ভীতিপ্রদ। প্রিয়তমার মৃত্যুর পর কবি "হা প্রিয়া অনলদগ্ধা!" বলিয়া আর্তনাদ করিয়া আবার পরক্ষণেই বলিয়াছেন,—

"সতি, মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি,
তুমি যাহে দেছ পদ, সে যে ফুল্ল কোকনদ,
সে নহে শ্মশান চুল্লি ভীষণ মুরতি।

মৃত্যু যদি নাহি হয় প্রেম হ'তে মধুময়,
দিবেন কন্যাবে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি ?

মৃত্যুকে অতিক্রম কবিবার আকাঙ্খাব সহিত ভগবানেব উপর বিশ্বাস জড়িত হইয়া বহিয়াছে, কিন্তু সে বিশ্বাসও প্রশ্নবর্জ্জিত নয় !

"চিরদিন ধরি, ধবি,
খুঁজিয়া খুঁজিযা মবি,
সেই, এই এই কবি যাবে কি জীবন ?"

অথবা, "বিহঙ্গম ডাকে যে প্রত্যুষে,
ডাকে সে কি বৃথায়—বৃথায় ?"
গৃহচূড়ে নব যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীবে ধীবে,
এ জগতে নিবন্তব বাহি শোক দুঃখ স্তব
উঠে কি মানব আত্মা তোমাব মন্দিবে ?"

আবাব নির্ভব ও আবেদন ,

জগতেব পাপ তাপ জগতেই শেষ
কব, দয়াময় !
উঠিয়া পর্ব্বত-চূড়ে হেবি ধবাতল দূবে
পথেব সে দুঃখ ক্লেশ ভ্রম মনে হয় ।

বড়াল কবি অনুভব কবিয়াছেন-পৃথিবীব জলে স্থলে বাহিবে ও অন্তবে নিবত যেন আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে ।
সেই আহ্বানই পৃথিবীব আদি ধ্বনি ওঙ্কাব,

"জীবনেব এ সঙ্গীত পবিত্র মহান্ ।
কি ধীব গম্ভীর শব্দ
ধবণী ধূসব স্তব্ধ
বাজিছে পিনাকী-কবে প্রলয়-বিষাণ ।"

নিবন্তর যেন এক সংগ্রামের আহ্বান এই জীবন সঙ্গীতে। হে মানব! অগ্রসব হও জয়ের পথে, সংগ্রাম কব দ্বিধা ও দুর্ব্বলতাব সহিত, সংগ্রাম কব অলস্য বিলাসিতা ও আত্মতুষ্টিব সহিত। তোমাব ভিতব যে কুলকুণ্ডলীনি শক্তি নিদ্রিতা বহিয়াছেন জাগ্রত ক' তাঁহাকে। জাগ্রত কব· তাঁহাকে বণবঙ্গিনী সর্ব্বত্যাগিনী রূপে:

"এস বণে কপালিনী—
কাল ভয় নিবাবিণী
মুক্তকেশী, উলাঙ্গিণী, পদে ত্রিলোচন,
জীবনেব এ সঙ্গীত পবিত্র ভীষণ।

জীবন সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইতেছে ভয়েব ভিতব অভয় মন্ত্র মৃত্যুব ভিতব অমৃতেব বাণী, ভীষণতাব ভিতব মাধুর্য্যেব আস্বাদ:

"জীবনেব এ সঙ্গীত পবিত্র মধুব।
আবেশে অবশ প্রাণ,
মুদে আসে দু'নয়নে,
ঘুমে আলুথালু বধা, সোহাগে বিধুব!

*　　　*　　　*

আকুল ব্যাকুল আশা,
কি পিপাসা, নাহি ভাষা,
হৃদয় ভ্রমিছে কোথা, কোন্ স্বর্গপুব?
জীবনেব এ সঙ্গীত পবিত্র মধুব।

কিন্তু বধিব মানব এ সঙ্গীত শুনিতে পায় না, সে পথ ছাড়িযা বিপথে ছুটিতেছে। এত সুন্দব এই পৃথিবী, পাখীব কাকলি, নদীব কুলুকুলু, দিন ও বজনীব মধুব বহস্যে পবিপূর্ণ মঙ্গলময়ী বসুন্ধবা।

"কি জন্য গড়িলে ধরা, কবি এত মনোহরা,
সেই শুভ বসুন্ধরা ছুটে যে বিপথে,
তোমারি প্রদত্ত জ্ঞান হের জ্ঞানময়
লুপ্ত অহঙ্কারে,
ভক্তি বাচালতাময়, সুখ শান্তি স্বার্থে লয়,
স্নেহ প্রীতি মৃতপ্রায় অবিশ্বাস ভরে।'

প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর বড়াল কবি একটি গভীর অনুভূতির স্পর্শ লাভ করিয়াছেন; তাঁহার সন্ধ্যার বর্ণনায়,

"ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে
পুলিনে, তুলসীতলে,
যেন শতচক্ষু মেলি হেরিছে ধরণী।"

'শ্রাবণে' কবিতার ভাষায় একটি মেঘে ঢাকা দিনের তন্দ্রাচ্ছন্নভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১২৯৭ সালে 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি কবিতা বড়াল কবি লিখিয়াছিলেন। সেই কবিতার ভাব এই যে, রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় যেন এক নব প্রভাতের অভ্যুদয়। কবিতাটি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম:

"দূরে—মেঘ শিরে-শিরে পূরব আকাশে
ফুটে স্বর্ণরেখা সম প্রভাত কিরণ।
তরুলতা নতমাথা—ডাকে পুষ্প বাসে,
বিহঙ্গম কলকণ্ঠে করে আবাহন।
শিথিল পাণ্ডুর শশী—মেঘখণ্ড পাশে,
পলাইছে নিশিথিনী ধূসর বরণ
ঝরণা ঝরিছে দূরে, বায়ু মৃদু শ্বাসে,
পাটল তটিনী বক্ষে আলোক-কম্পন।

ফুটিছে হিমাদ্রি শৃঙ্গে হিরণ্য কুসুম!
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর!
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব কুটির,
অঙ্গনে দোহন গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞধূম!
অর্দ্ধ নিদ্রা জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি,
জীবনে স্বপনভ্রম ফুটে রবিকর।

এখানে হিমাদ্রিশৃঙ্গে তপোবনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে অন্যত্রও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। 'শঙ্খ' গীতি কাব্যে 'ত্রয়ী' কবিতার শেষ স্তবকেও আছে এই তপোবনের দৃশ্য,

"সুমেরু-চুচুক-পাশে,
সুকুমারী ঊষা হাসে
বিসর্পী হোমাগ্নি ধূমে মরুত কাতর।
তুষার নীবার দলি'
ঋষিকন্যা যায় চলি
চরে সরস্বতী তীরে কপিলা নধর।
আহরি' সমিধ-ভার
আসে শিষ্য সুকুমার,
যজ্ঞকুণ্ডে ঢালে হবি, ঋত্বিক ভাস্বর।
সোম-গন্ধে সাম ছন্দে
নামিছেন কি আনন্দে
অরুণ, বরুণ, ইন্দ্র উজ্জ্বলি অম্বর।"

দুটি কবিতাতেই আছে প্রভাতের বর্ণনা, যজ্ঞধূমে আচ্ছন্ন তপোবন এবং অম্বর উজ্জ্বল করিয়া অরুণের অবতরণ। মনে হয়, স্বপ্নচৈতন্যের ভিতর দিয়া দুটি কবিতার ভিতরই একটি ভাবগত সংযোগ আছে।

স্বপ্নের ছবি রূপ হইতে রূপান্তরে পরিণত হয়। একটিতে অরুণ উদয় অর্থাৎ—অরুণরূপী রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়। অপরটিতে যজ্ঞশালা আমাদের

এই ভারতবর্ষ। নিশীথের অবসান ও উষার উদয়। দুগ্ধবতী কপিলাগাভী সৌভাগ্য ও স্বচ্ছলতার প্রতীক স্বরূপা। ইন্দ্র, বরুণ ও অরুণ ইহাঁরা সকলেই সম্পদ ও প্রাচুর্য্যদাতা দেবতা।

রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ও এই ভারতবর্ষে, এই অভ্যুদয়ের সহিত ভগবদ্-অনুভূতি ও স্বপ্নচেতনার মাধুর্য্য উভয়েরই সংযোগ রহিয়াছে। এই অভ্যুদয় মহাসম্পদে সম্পদশালী করিয়াছে কবির জন্মভূমিকে।

ভারতবর্ষ! বড়াল কবির জন্মভূমি। বিশেষ করিয়া সাগর উত্থিতা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী বঙ্গভূমি। 'শঙ্খ' গীতিকাব্যে 'কিসের অভাব' শীর্ষক কবিতায় কবি জন্মভূমিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "মা তোমার কিসের অভাব? তোমার সাধক সন্তানগণ প্রত্যেকেই নিজের জীবনের সকল সাধনার ফল তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন।

"কেহ দেছে কাব্য, কেহ গীতি গান,
কেহ দেছে শক্তি, বিশ্বব্যাপী মান,
কেহ দেছে দেহ, কেহ দেছে প্রাণ—"

বঙ্গভূমি, সর্ব্ব গৌরবভূষিতা রাজরাজেশ্বরী, বড়াল কবি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন :

"এস চণ্ডীদাসগীতি, শ্রীচৈতন্য প্রীতি
রঘুনাথ জ্ঞানদীপ্তি জয়দেব ধ্বনি!
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম জননী!'

আবার দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইতেছে, কবি দেখিতেছেন, পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সেই রাজরাজেন্দ্রাণী ভিখারিণী বেশে অতীতের লুপ্ত সম্পদের সন্ধানে ঘুরিতেছেন ;—

"হেরি তুমি সাশ্রুনেত্রে অবনতশিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুখিনী।
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি অতীত-কাহিনী।"

দেবগণ সমুদ্র-মন্থন করিয়া নানা রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, বঙ্গ কবিগণও কবিত্ব-সিন্ধু মন্থন করিয়া নানা সম্পদ লাভ করিয়াছেন, কবির বর্ণনায়;—

"মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ কবিগণ,
লইল বাঁটিযা সুধা অমরা-বিভব:
রঙ্গলাল নিল শশী, নির্ম্মল কিরণ,
নিল ঐরাবতে মধু দ্বিতীয় বাসব,
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্ল্লভ!
বিহারী করুণা-লক্ষ্মী করুণলোচন,
রবি নিল পারিজাত ত্রিদিব-সৌরভ।

মধুসূদন বঙ্গজননীর কাছে 'অমরত্ব' প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন,

"ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে মা যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে কি শরদে।"

এই অমরত্ব লাভই সাহিত্য-সাধকের একান্ত কামনা। ডারউইন প্রাণী-গণের জীবন যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন জীবন সংগ্রামে যে সকল প্রাণী স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে তাহারাই জয়ী হয়। কাব্যদর্পণকার সাহিত্যকে সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী বলিয়াছেন, অর্থাৎ যে সাহিত্য জনগণের মনে চিরস্থায়ী আসনলাভ করিতে পারে সেই সাহিত্যকেই জীবন যুদ্ধে জয়ী বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিশেষতঃ তাঁহার 'কমলাকান্তের' দপ্তর মানুষের চিত্তহরণ করিয়া চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়াছে। কালিদাস এখনও চিরজীবি হইয়া আছেন। সেক্সপিয়র মরিয়াও মরেন নাই। রবীন্দ্রনাথ

'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' কবিতায় শতবর্ষের পরে যে কবি জন্মগ্রহণ করিবেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ;

"আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে।"

বড়াল কবিও অমর হইয়া আছেন তাহার প্রিয় দেশবাসীর হৃদয়ের অনুভূতিতে, কবির সম্বন্ধে প্রবন্ধ শেষে আমরা এই কথাই উল্লেখ করিতে পারি।

বড়াল কবির রচনা-বলী বহু মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে 'রজনীর মৃত্যু' ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। অন্যান্য যে সকল পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার নাম এখানে দেওয়া হইল।

রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত 'বীণা,কল্পনা, বিভা, কর্ণধার, ভারতী, নব্য ভারত, জন্মভূমি, সাহিত্য, প্রদীপ, জাহ্নবী, বাণী, অর্চ্চনা ও আর্য্যাবর্ত্ত।'

তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা 'স্বজাতি-সম্ভাষণ' চুঁচুড়ায় বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক সম্মেলনে পঠিত ও 'সুবর্ণবণিক সমাচার' পত্রিকায় ১৩২৫ সালে মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমার 'এষা' কাব্য লিখিবার পর আর বিশেষ কিছু লেখেন নাই সে জন্য 'এষা'কেই যদিও তাঁহার শেষ রচনা বলা চলে কিন্তু ১৩১১ সালের 'সাহিত্যে' 'ওমারের অনুকরণে' 'পান্থ' নামে উনত্রিশ স্তবকে গ্রথিত যে রচনাটি বাহির হইয়াছিল দশ বৎসর পরে তাহারই শেষাংশ ১৩২১ সালের 'সাহিত্যে' বাহির হয়। ঐ বৎসরের ভাদ্র সংখ্যায় 'আমি সে প্রণয়ী ?' নামে একটি কবিতাও বাহির হয়, এই রচনাগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয় নাই।

'আমি সে প্রণয়ী ?' কবি কোন এক যৌবনগর্ব্বিতাকে সম্বোধন করিয়া

বলিতেছেন, "একদিন তরুণ জীবনে আমি বহু প্রেমের কবিতা রচনা করিয়াছি, আজ জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়াছি ,—

"চাহ চাহ মুখপানে এবে বৃদ্ধ আমি,
হে যৌবনময়ী,
কহ কহ সত্য করি কর কি বিশ্বাস
আমি সে প্রণয়ী ?"

কবি অক্ষয়কুমার পাঁচখানি মাত্র গীতিকাব্য রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে চিরদিনের জন্য অক্ষয় আসন অধিকার করিয়াছেন। সাহিত্য নিত্যই নূতন নূতন পথে অগ্রসর হইতেছে। নিত্য নূতনের উদ্ভবের ভিতরও যে রচনায় প্রকৃত প্রাণবস্তু আছে তাহাই চিরন্তনী হইয়া রহিয়াছে। একদিন মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বাংলা দেশে কবি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, একদিন দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' রচনা করিয়া নাট্যকার খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, যে পারিপার্শ্বিককে অবলম্বন করিয়া এই সকল রচনা সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল সে পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই সকল রচনা রসগ্রাহী পাঠকের নিকট সময়ের পরিবর্ত্তনেও সমভাবেই রসাস্বাদন-পরিবেশনে সক্ষম রহিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের রচনার ভিতর যে বিশেষত্বটি পাঠকের মন আকর্ষণ করে তাহা একদিকে তাঁহার অতি সজীব ও সরল রচনাভঙ্গী, অপর দিকে শব্দ ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত রচনার দুর্ব্বার গতি। সেকালের বাঙ্গালীর ঘরের, হিন্দুর গৃহস্থালীর সুখ দুঃখ ও শোকের চিত্র তাঁহার 'এষা' নামক শোককাব্যে যে ভাবে প্রাণময় হইয়াছে, অন্যত্র তাহা দুর্ল্লভ। এই চিত্রময়ী কাব্য খানিকে গত কালের মধ্যবিত্ত হিন্দুপরিবারের সামাজিক ইতিহাসও বলা যায়।

সাধারণতঃ বড়াল কবিকে প্রেমের কবিই বলা চলে।

ভালবাসাই তাঁহার কবিতার মূলধন। কবি আদর্শবাদীও বটেন, কিন্তু স্বতঃ-প্রবাহিত ভালবাসার উৎসই তাঁহার আদর্শকে জীবন্ত করিয়াছে ও উজ্জ্বল করিয়াছে।

তাঁহাব আদর্শ প্রতিভাসিত হইযাছে মানুষকে পূর্ণতম—মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত কবিবাব আকাঙ্খায়। বিশ্বেব সমস্ত মানবই তাঁহাব বচনাব পাত্র, এবং সেই মানবেব ভিতব তিনিও একজন।

মনুষ্যত্বেব গর্ব্বে তিনি গর্ব্বিত, আবাব মনুষ্যত্বেব অধোগতিতে তিনি মর্ম্মাহত। সৃষ্টিবহস্য তিনি দার্শনিকেব দৃষ্টিতে বিচাব ও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাব 'পান্থ' কবিতায় সেই বিচার ও বিশ্লেষণই পরিস্ফুট হইয়াছে, এই কবিতাটি দীর্ঘ, তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত কবিয়া এই কবি প্রশস্তির পরিসমাপ্তি করিলাম।

এই কবিতাটির ভাব এই যে, জীবনের পথে যাত্রা কবিয়াছে এক পান্থ। যাত্রাপথে যে প্রেবণাবাণী অবসন্ন ও নিদ্রাতুব পান্থকে উৎসাহ ও সাহস দান করিতেছে এবং পথেব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও দান কবিয়াছে তাহাই কবিতাব স্তবকে স্তবকে গ্রথিত হইয়াছে।

"আর ঘুমায়োনা পান্থ মেলহ নয়ন" ইহাই কবিতাব সূচনা।

জীবন পথেব পথিক,—সে পথে যেমন সুখও আছে সেইরূপ দুঃখও আছে। কখনও পথ সবল, কখনও অতি দুর্গম।

উদয় আছে, আবাব অবসানও আছে। আছে জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা, আবার আছে অন্ধকার অমানিশা। কত বসন্ত আসিয়াছে, আবাব চলিয়া গিয়াছে।

"এমনি বসন্ত গেছে ল'য়ে ফুলদল।
নাহি সে মথুবাপুবী, নাহি সে কোশল।
নাহি সে বাল্মীকি ব্যাস, নাহি কালিদাস,
চঞ্চল জীবন অতি, মৃত্যু অচঞ্চল।"

* * *

ক্ষণস্থায়ী এই জীবন! পানপাত্র হাতে লও, জীবনেব তিক্ত বা মধুব যে আস্বাদই হোক না কেন এই পানোন্মত্ততার ভিতবেই বহিয়াছে জীবনেব প্রকৃত আস্বাদ।

"ধব ধব হৃদিপাত্র—একমাত্র বস !
তিক্ত হোক্ মিষ্ট হোক্ চেতনা অবশ

*　　*　　*　　*

পানপাত্র পূর্ণ কব, বিনষ্ট প্রভাস—
বেখে গেছে কিন্তু তার বিস্মৃতি প্রয়াস।

*　　*　　*　　*

করে ধরা হবে স্বর্গ, কিংবা রসাতল—
দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে চিব কোলাহল।
যে যাহার ভেরী তুবি বাজায় আপনি,
নগদে সন্তুষ্ট আমি ধাবে কিবা ফল !

*　　*　　*　　*

কল্য—ওহো গতকল্য কবেছে প্রস্থান
লইয়া বঙ্কিম, মধু, বিহাবী, ঈশান !
আজ আমি আছি যবে, জগত-চষকে
প্রাণপণে প্রাণ ভবি কবি সুধাপান !

*　　*　　*　　*

এক আসে আব যায়, কিবা তায় খেদ !
ক্রমশঃ হতেছে গাঢ মেদিনীব মেদ।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে চবিছে গোপাল,
পাণ্ডবে কৌববে আজ কিবা অভিভেদ !

*　　*　　*　　*

কে বলিবে সত্যনয়—এ পলাশ মূলে
অর্জ্জুনেব তপ্ত বক্ত নাহি আজ দুলে !
কে বলিবে সত্য নয়—ফুটে নাই আজ
সীতাব সে পদ্মচক্ষু এ পদ্ম মুকুলে !

অপরূপ এই সৃষ্টি রহস্য! কুম্ভকার গৃহে কুম্ভকার কর্দ্দম ছানিয়া মাটির পাত্র গড়িতেছে নানা গঠনের, তেমনি কোন্ অদৃশ্য শক্তি গঠন করিতেছে মানুষের শরীর ও মন। কর্দ্দমের পিণ্ডের যদি কথা বলিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে সে হয়তো তাহার সৃষ্টি'কারী কুম্ভকারকে নানা অনুযোগ করিত বা পরামর্শ দিত। অথবা কে এই সৃষ্টি করিয়াছে তাহা লইয়া এইভাবে বিতর্ক করিত।

"কেহ কহে,—'ভাঙ্গিও না থাকুক এমনি,'
কেহ কহে—'ভেঙ্গে গড ওগো গুণমণি।'
কেহ কহে—'কে কুলাল? কাহার দুলাল?
কেহ কহে—'কার দোষ? গড়েছ আপনি।
সবে চায়, কেহ পায়, কেহ বা হারায়,
শস্য কারো জন্মে, কারো হাজে বরষায়,
বর্ষাশেষে সযতনে কৃপালু কৃষক—
শুষ্ক ধান্যবৃক্ষমূলে আগুন লাগায়।

* * * *

বিশুষ্ক কমল দল, পিক ভগ্নস্বর,
তরু শ্যামপত্রহীন অরণ্য ধূসর,
আসিছে দুরন্ত শীত, হে শ্রান্ত পথিক
উঠ, উঠ, গৃহমুখে চল অতঃপর!

* * * *

খুঁজিয়াছি—পাই নাই, এইমাত্র দুখ,
দুঃখের এ অন্বেষণ, প্রেমের তো সুখ!
প্রেম নহে আহরণ, চির অপব্যয়,—
ইহ-পর-সর্ব্বকাল দিয়াই সে মরুক।

প্রেম আহবণ নয় চিব অপব্যয, ইহ-পবকালে প্রেমিক দান কবিয়াই চলুক প্রেমিক কবিব ইহাই শেষ সমাধান।

বড়াল কবিব বচনাবলী :

'প্রদীপ' (গীতি কাব্য) ১২৯০ চৈত্র ইং ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি ৬৮ পৃষ্ঠা। 'প্রদীপেব' তৃতীয় সস্কবণে সাহিত্য সম্পাদক স্বর্গীয় সুবেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় প্রারম্ভিক প্রস্তুতি লেখেন।

'কনকাঞ্জলী' (গীতি কাব্য) ১২৯২ সাল ইং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রণ। তৃতীয় সংস্কবণে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমাব মৈত্র মহাশয় ইহাব ভূমিকা লিখিয়াছেন গ্রন্থখানি ১০৭ পৃষ্ঠা।

'ভুল' (গীতি কবিতাবলী) ১২৯৪ সাল ইংবাজী ১৮৮৭ সালে প্রথম মুদ্রণ। ১২৯ পৃষ্ঠা। ১২৯৪ সালেব কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভাবতী' ও 'বালকে' গ্রন্থখানিব সমালোচনা হয়।

'শঙ্খ' (গীতি কাব্য) প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ সাল আশ্বিন, ইবাজি ১৯১০, ১২৭ পৃঃ।

দ্বিতীয় সংস্কবণে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাব অনুবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় সংস্কবণে ১৩৩ পৃষ্ঠায় বর্দ্ধিত হয়।

'এষা' (গীতিকাব্য) পত্নীব স্মৃতিব উদ্দেশ্যে বচিত। প্রথম প্রকাশ ১৩১৯ শ্রাবণ মাস ইংবাজী ১৯১২, ১৬৭ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় সংস্কবণেব প্রকাশ কাল ১৩২০ ভাদ্র, বর্দ্ধিত আকাবে ১৭৫ পৃষ্ঠা। এই সংস্কবণে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 'পবিচয়' লেখেন।

রবীন্দ্রনাথের 'মানুষ'

ববীন্দ্রনাথের বচনা মাত্রই চিত্রধর্ম্মী। তাই তাঁহাব বচনায় আমবা যে সকল বহু বিচিত্র চিত্র দেখিতে পাই তাহা আলোচনা কবিলে বুঝিতে পাবি তাহার সবগুলিই বিভিন্নভাবে মানুষেবই ছবি।

তাঁহার কবিতায়, কবিতায় রচিত কাহিনীগুলিতে, তাঁহাব ছোট গল্পে ও উপন্যাসে এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনীয় সর্ব্বত্রই গূঢ়-ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে মানব-চরিত্রেব চিত্র।

মানুষ ও সাহিত্য

মানুষ একাধাবে বাহিবেব জগৎ ও মানসজগতেব অধিবাসী। কবিমানসে মানুষেব যে রূপটি ধবা পডিয়া যায় সাহিত্যেব সঞ্চয়েব ভিতর দিয়া তাহা চিরদিনেব জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকে, মবণধর্ম্মী মানুষ তাই সাহিত্যের ভিতব দিয়াই অমবত্ব প্রাপ্ত হয়।

ববীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবিশ্রেষ্ঠ, তাই মানুষেব চবিত্র—যাহাকে এক হিসাবে অপরূপ বলা চলে, সেই অপরূপকে রূপ দান কবা তাঁহাব পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। তাই তাঁহাব বচনায় আমবা যে সকল মানুষেব ছবি পাই তাহা এত জীবন্ত ও এমন হৃদয়গ্রাহী।

ববীন্দ্রনাথ তাঁহাব 'সাহিত্যের তাৎপর্য্য' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "মানুষেব হৃদয়েব ন্যায় মানুষেব চরিত্রও এমন একটি সৃষ্টি, যাহা জডসৃষ্টিব ন্যায় আমাদেব ইন্দ্রিয়েব দ্বাবা আয়তগম্য নহে। * * * তাহা মানুষেব পক্ষে পরম ঔৎসুক্যজনক কিন্তু তাহাকে পশুশালাব পশুব মত বাঁধিয়া খাঁচাব মধ্যে পুরিয়া ঠাহব কবিয়া দেখিবাব সহজ উপায় নাই।"

অর্থাৎ ধবাবাঁধার অতীত বিচিত্র এই মানব চরিত্র। কবিব মতে সাহিত্য ইহাকে অন্তবলোক হইতে বাহিবে প্রতিষ্ঠিত করিবাব জন্য সাধনা করিতেছে,

কিন্তু সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজ নয়। কেননা মানব চরিত্র গতিশীল। নদীর প্রবাহের মত নিয়ত চঞ্চল ও অস্থির। কবি বলিয়াছেন, "এই চরিত্র অঙ্কন অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ, মানবচরিত্র স্থির নহে, সুসংগত নহে,—তাহার অনেক অংশ, অনেক স্তর,—তাহার সদরে-অন্দরে অবারিত গতিবিধি সহজ নয়। তাছাড়া, তাহার লীলা এত সূক্ষ্ম, এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ। ব্যাস-বাল্মিকী-কালিদাসগণ এই কাজ করিয়া আসিতেছেন।"

কবি আরও বলিয়াছেন, "ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে—মানব চরিত্রের মধ্যে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার—ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার অন্ত নাই, ইহা বিচিত্র।"

মানুষ চায় মানুষকে। অতীতকালে কত মানুষের জীবনে কতই না ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই অতীতের ঘটনা লইয়া রচনায় এবং অনাগত মানুষের জীবনের ঘটনাবলী কি ভাবে ঘটিতে পারে তাহার কল্পনায় মানুষ বিমুগ্ধ। সাহিত্য এই ঘটনা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া চিত্রের ন্যায় অঙ্কন করিবার ভার লইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিযাছেন, "প্রত্যেক মানুষের পক্ষে 'মানুষ' হওয়াই প্রথম দরকার। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে—যার দ্বারা প্রতিনিয়ত—আমরা শিকড়ের মত বিচিত্র রসাস্বাদন করছি সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তা'র নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা,—চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগসাধন করা, ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে তোলা—সাহিত্য এমনি করে আমাদের 'মানুষ' করছে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের ও মানুষকে আপনার বলে অনুভব করছি।" * * * সংক্ষেপে এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানব চরিত্র।"

'মানুষ' এই নামটিই একটি বিশেষ গৌরবের অধিকার দাবী করে।

সৃষ্টিতে জড় আছে, আবার নানা শ্রেণীর প্রাণী ও তরুলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ আছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রূপ রাজবাড়ির নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কি হইবে? এক এক ঋতুতে এক এক মহল হইতে মানুষের কাছে প্রকৃতির নিমন্ত্রণ আসে, কিন্তু মানুষ যদি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে, আপন আড্ডের গদীতে পড়িয়া থাকে তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল? * * * সে দম্ভ করিয়া বার বার এ কথা বলিতেছে, 'আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশু নহি,—আমি মানুষ। কেন সে একথা বলে না আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে, স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।"

মানুষের ভিতরে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে

কবি প্রশ্ন করিয়াছেন, "আমরা কি এতই একান্ত মানুষ? আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রস-সঞ্চার-বিকশিত তরুলতা পুষ্প পল্লবের কেহই নহি?"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। * * * কোন এক আদি যুগে আমরা নিশ্চয়ই পাখী ছিলাম তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি?"

আর যে কেহ ভুলুক বা না ভুলুক কবি কখনই ভুলিতে পারেন নাই। তরুলতার সহিত তাঁহার নিবিড় আত্মীয়তা তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। কালিদাস মেঘের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া প্রিয়ার সন্নিধানে বার্তা পাঠাইবার জন্য তাহাকেই দূতরূপে বরণ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আকাশ বাতাস ও আলোক সকলের মধ্যেই ব্যক্তিত্ব খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাঁহার শান্তিনিকেতন-তপোবনে আশ্রম-বালকের মত আশ্রম-পাদপদলও অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছে মঙ্গলাচরণে ও শুভ কামনায়।

মেঘদূত কাব্যের সমালোচনায় কবি বলিয়াছেন, "আমরা যখন সম্পন্ন

গৃহস্থটি হইয়া আরামে সন্তোষের অর্দ্ধনিমীলিত লোচনে যে গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম কালিদাসের মেঘ 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' হঠাৎ আসিয়া সেখান হইতে আমাদের 'ঘরছাড়া' করিয়া দিল।" মানুষ জন্ম-জন্মান্তরে অনন্ত পথের যাত্রী।

মানুষ অনন্ত পথের যাত্রী

জন্মের পর জন্ম অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতে মানুষ বিস্মৃত হইয়া যায় অতীত জীবনের সৌহৃদ্যের কাহিনী। কবি বলিয়াছেন বর্ষার নবমেঘ মানুষকে তাহার সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া নব নব যাত্রা পথে নূতন পরিচয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে করিতে অজ্ঞাত লোকের উদ্দেশ্যে লইয়া চলে। নব মেঘের আর একটি কাজ আছে, সে আমাদের চারিদিকে একটি পরম নিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া 'জননান্তর সৌহৃদানি' স্মরণ করাইয়া দেয়।

'জন্ম জন্মান্তর' এই উক্তিটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে মৃত্যুর ইঙ্গিত। কবি বলিয়াছেন "অহরহঃই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালকে ও মন্দকে উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে।"

কিন্তু মানুষ এই অমোঘ পরিণাম যে মৃত্যু, তাহাকেও স্বীকার করে নাই।

মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের 'কিমাশ্চর্য্যম্' এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, নিয়তই লোকে যম-মন্দিরে যাইতেছে, তবুও লোকে মনে করে আমি চিরকালই বাঁচিয়া থাকিব, ইহা হইতে আর অধিক আশ্চর্য্য কি আছে?"

অর্থাৎ অমরত্বের উপর মৃত্যুশীল মানবের মনে আছে একান্ত বিশ্বাস। তাই সে প্রতিনিয়ত মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াও মৃত্যুকে স্বীকার করিতে চাহে না।

রূপ কথায় পদে পদে মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিতেছে, তাই রূপকথা কেবল ছেলেদের নয় বড়দেরও প্রিয়।

শিশু মনস্তত্বের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"চিন্তাহীন, মৃত্যুহীন
চলিয়াছে চিরদিন
খোকাদের গল্প-লোক মাঝে।
সেথা ফুল গাছপালা
নাগকন্যা রাজবালা
মানুষ, রাক্ষস, পশু, পাখী—
যাহা খুসী তাই করে,
সত্যেরে কিছু না ডরে,
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি।"

কবির 'সোনার তরী' গ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা—

'যেতে নাহি দিব।'

হেমন্তের দ্বিপ্রহর, দুয়ারে গাড়ি প্রস্তুত রহিয়াছে। গৃহকর্ত্তা বিদেশে কর্ম্মস্থানে যাইবেন তাহারই আয়োজন চলিতেছে।

"ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে,
বাঁধিছে জিনিস-পত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ ঘরে ও ঘরে ;
ঘরের গৃহিণী চক্ষু ছল ছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের মাঝে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড তরে, বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে। * * *

পিতার আদরিণী চার বছরের মেয়েটি দুয়ারের কাছে বসিয়া এই যাত্রার আয়োজন দেখিতেছে।

এতক্ষণ—

অন্য দিন হয়ে যেত স্নান-সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে, আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে, এতবেলা হ'য়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্ণিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্ত দেহে এবে
বাহিরের দ্বার-প্রান্তে কি জানি কি ভেবে'
চুপি চাপি বসেছিল। কহিনু যখন
"মা গো, আসি" সে কহিল বিষণ্ণ নয়ন
ম্লান মুখে, "যেতে আমি দিব না তোমায়।"
যেখানে আছিল বসে' রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল—"যেতে আমি দিব না তোমায়"
তবুও সময় হ'ল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।

সময় শেষ হইলে যাইতে দিতেই হয়, না দিয়া উপায় নাই, পৃথিবীর ইহাই চিরদিনের নিয়ম।

কবি বলিতেছেন,— "ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কেরে তুই? কোথা হ'তে কি শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা এত স্পর্দ্ধা ভরে—
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" চরাচরে—
কাহারে রাখিবি ধরি দুটি ছোট হাতে
গরবিনী, সংগ্রাম করিবি কার সাথে?

বসি গৃহদ্বার প্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ :
'যেতে নাহি দিব' শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ব্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত, চোখে জল ভরে'
দুয়ারে রহিলি বসে' ছবির মতন,
আমি দেখে চলে' এনু মুছিয়া নয়ন।

* * * *

চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" ধরণীর
প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ত তীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
'যেতে নাহি দিব।' তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, 'যেতে নাহি দিব।'
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিভ নিভ,
আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তারে?
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব নারে!'
প্রেম বলে,
'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির, আমি তাঁর—
পেয়েছি স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির অধিকার লিপি।" তাই স্ফীত বুকে—
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, "মৃত্যু তুমি নাই" হেন গর্ব্ব কথা।

প্রেমের শক্তিতে
মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী

কবি বলিতেছেন, "মানুষ মরিয়াই মৃত্যুকে জয় করে।"

"চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে,
ঝড়, ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপ খানি। * *
ছুটেছে সে নির্ভী· পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন সয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।"

মনুষ্যত্বের পরীক্ষা

রবীন্দ্রনাথ মানুষের এই মৃত্যুঞ্জয়া মহিমার বিশেষ ভাবে স্তুতি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয় মৃত্যুর কষ্টি পাথরে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মাভৈঃ' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টি পাথরের মত, ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।"

"তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস—তাহার চরম পরীক্ষা দেশের জন্য মরিতে পার কিনা?"

মৃত্যুর খাঁড়া সর্ব্বদাই মানুষের মাথার উপর ঝুলিতেছে, কখন অথবা কি ভাবে সে খাঁড়া পড়িবে কে জানে?

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্ব্বজনীন ভয় যদি মাথার উপর না ঝুলিত, তবে সত্য মিথ্যাকে ছোটো বড়ো মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোন উপায় থাকিত না।"

"মৃত্যু যিনি তাঁহারেই ধর্ম্মরাজা, মানি।"
ইহাই কবির উক্তি।

চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন,

পীরিতি পীরিতি কহে সব জন,
পীরিতি বিষম কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ত্যাজিলে
পীরিতি মিলয়ে তথা।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এই মৃত্যুর তুলায় যে সব জাতিব তৌল হইয়া গিয়াছে তাহারাই পাসমার্ক পাইযাছে। তাহাবা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে নিজের কাছে ও পরের কাছে। তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবাব কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পবীক্ষিত হইয়া গেছে। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে। যাহার প্রাণ আছে তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবাব শক্তিতে। যাহার প্রাণ থাকিয়াও প্রাণ নাই, সেই মবিতে কৃপণতা করে।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, "যে মরিতে জানে সুখের অধিকাব তাহারই। যে জয় কবিবাব সামর্থ্য রাখে ভোগ কবা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবন যাপনে সুখকে বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে প্রকৃত সুখ কখনই সে পায় না। সুখ তাহার সেই ঘৃণিত কৃতদাসেব কাছে নিজেব সমস্ত ভাণ্ডাব খুলিয়া দেয় না, তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বাবে ফেলিয়া বাখে।"

সুখের অধিকার

"আব মৃত্যুব আহ্বানমাত্র যাহাবা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চিব আদৃত সুখেব দিকে একবাব পিছন ফিবিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহাবা সবলে ত্যাগ কবিতে পাবে তাহাবাই প্রবল ভাবে ভোগ কবিতে পাবে। যাহাবা মবিতে জানে না, তাহাদেব ভোগ বিলাসের দীনতা কৃশতা ঘৃণ্যতা—গাড়ি জুড়ি এবং তকমা চাপবাসেব দ্বাবা ঢাকা পড়ে না।"

মবিতেও শিখিতে হয় এবং বাঁচিতেও শিখিতে হয়।

"বল মিথ্যা আপনাব সুখ, মিথ্যা আপনাব দুঃখ,
স্বার্থ বশে যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হ'তে,
সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।"

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "দুই রাস্তা আছে—এক ক্ষত্রিয়েব বাস্তা, আর এক

ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে, পৃথিবীর সুখসম্পদ তাহাদেরই। যাহারা সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।

দুইপথ, গ্রহণের পথ ও ত্যাগের পথ

'প্রাণটা দিব' একথা বলা যেমন শক্ত, সুখটা চাই না একথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। হয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে 'চাই'। নয় বীর্য্যের সঙ্গেই বলিতে হইবে 'চাই না।'

পিতামহগণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অভিযোগ আছে; সে অভিযোগ এই যে, "সেই তো আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালোমন্দ কোন একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমত মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি সে ভাবে মরিতেন, তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তি সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম।" * *

"অথচ যখন ভাবিয়া দেখি আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন, আশা করি মরাটা তেমন কঠিন হইবে না। অবশ্য তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়াছেন বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।"

"মন হইতে ভয় একেবারে যায় না, কিন্তু ভয় পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজ্জা করা চাই।"

"যেখানে নির্ভীকতা নাই সেখানে এই লজ্জার চর্চ্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের ন্যায় লজ্জাও লোককে বল দেয়। লোক-লজ্জায় প্রাণ বিসর্জ্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়।"

"অতএব আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিয়াছিলেন এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাণ দিবার শক্তি ও সাহস তাঁহাদের ছিল—লজ্জায় হোক্, প্রেমে হোক্, ধর্ম্মোৎসাহে হোক্, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন একথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণের ন্যায় বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রেও বিরল।"

"বাংলার সেই প্রাণ-বিসর্জ্জন-পরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম

করি। তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্য্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে প্রবর্ত্তিত কর।"

মানুষ চায় মানুষকে। আর যত কিছুর উপর তাহার আকর্ষণ থাকুক না কেন, মানুষের উপরেই তাহার সকলের অপেক্ষা অধিক আকর্ষণ।

কবি বলিয়াছেন, "ফুলের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মানুষের মুখ আমাদের বেশি টানে, কেন না, মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুষমা নয়, তাহার চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের লাবণ্য আছে; তাহা আমাদের চৈতন্যকে, বুদ্ধিকে, হৃদয়কে দখল করিয়া বসে। তাহা আমাদের কাছে ফুরাইতে চায় না।"

মানুষমাত্রই সৌন্দর্য্যের উপাসক, প্রাচুর্য্যের উপাসক, আবার বীরত্বের ও মহত্ত্বের উপাসক। এই সকল গুণ সকল মানুষের মনে হয়তো বিকাশ লাভ করে না কিন্তু অপরের গুণাবলী সে নিজ চরিত্রে প্রতিবিম্বিত করিয়াও তৃপ্তি-লাভ করে।

কবি বলিয়াছেন, "যখন দেখি কোন বীরপুরুষ ধর্ম্মের জন্য স্বার্থ ছাড়িয়াছেন প্রাণ দিয়াছেন, তখন এমন একটা আশ্চর্য্য পদার্থ আমাদের চোখে পড়ে, যাহা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বেশি, আমাদের স্বার্থের চেয়ে বড়ো, আমাদের প্রাণের চেয়ে মহৎ।"

মানুষ অমঙ্গল চায় না মঙ্গলই প্রার্থনা করে। কিন্তু কোনটি প্রকৃত অমঙ্গল বা কোনটি মঙ্গল ইহা বুঝা সহজ নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মঙ্গল মানুষের নিকটবর্ত্তী অন্তরতর সৌন্দর্য্য, স্বার্থের ক্ষতিতে তাহার ক্ষতি হইবার জো নাই। মঙ্গলের নিজের ভিতরে এমন ঐশ্বর্য্য আছে, যে ঐশ্বর্য্যের জোরে ক্ষতি ও ক্লেশকে সে ক্ষতি ও ক্লেশ বলিয়া গণ্যই করে না।"

রবীন্দ্রনাথের মতে মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য উভয় উভয়ের সহিত এমনভাবে জড়িত যে, যেমন 'বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মীর মিলন।' লক্ষ্মী প্রাচুর্য্যের দেবী, আবার সৌন্দর্য্যের দেবী।

তাই কবি বলিয়াছেন, "আমাদের পুবাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তিই মঙ্গলের পূর্ণ মূর্ত্তি এবং মঙ্গলমূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যেব পূর্ণস্বরূপ।"

এখানে ববীন্দ্রনাথ 'সত্যে'ব উল্লেখ কবিয়াছেন। "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"।

তিনি বলিয়াছেন, "এই চঞ্চল সংসাবে আমবা সত্যেব আস্বাদ কোথায় পাই? যেখানে আমাদেব মন বসে। রাস্তাব লোক আসিতেছে, যাইতেছে, তাহাবা আমাদের কাছে ছায়া। * * যে বন্ধুকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি সে আমাদেব ততখানি আনন্দ দেয়। যে দেশ আমাব নিকট ভূ-বৃত্তান্তের একটি স্থানেব নাম মাত্র, সেই দেশেব লোকই সে দেশেব জন্য প্রাণ দেয়। তাহাবা দেশকে অত্যন্ত সত্যরূপে জানিয়াছে বলিয়াই তাহাব জন্য প্রাণ দিতে পাবে। মূঢেব কাছে যে বিদ্যা বিভীষিকা, বিদ্বানেব কাছে তাহা পবমানন্দের জিনিস, বিদ্বান তাহা লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিতেছে।" * *

মানুষের সত্যের অনুভূতি

"মানুষ তাহার কাব্যে, চিত্রে, শিল্পে তাহাব অন্তরগত সত্যমাত্রকেই উজ্জ্বল কবিয়া তুলিতেছে। * * সমস্ত তুচ্ছকে, অনাদৃতকে মানুষেব সাহিত্য প্রতিদিন সত্যেব গৌরবে আবিষ্কাব কবিয়া কলা সৌন্দর্য্যে চিহ্নিত কবিতেছে।" * *

"সত্যকে যখন শুধু আমবা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন আমবা তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই, তখনই তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ কবিতে পাবি। * * কুমাবসম্ভব কাব্যে ছদ্মবেশী মহাদেবেব মুখে শঙ্কবের রূপ, গুণ, বয়স, বিভবেব নিন্দা শুনিয়া তাপসী উমা কহিলেন, 'মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্'—ইহাব প্রতি আমাব মন একমাত্র ভাববসে অবস্থান করিতেছে। * * উপনিষদও বলিতেছেন, 'আনন্দরূপ-মমৃতং যদ্ বিভাতি' যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহাব আনন্দরূপ, তাঁহাব অমৃতরূপ।"

মানুষ ভাববসেব ভিতব নিমজ্জিত কবিয়া চোখে দেখা জিনিসকে পরম পরিতৃপ্তিব ও পবম বিস্ময়েব বস্তু কবিয়া তুলিতেছে। যাহা আছে, মানুষেব হৃদয়ের অনুভূতি তাহাকে নবসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত কবিয়া নূতন কবিয়া আবিষ্কার করিতেছে। সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, সঙ্গীতে মানুষ তাহার সেই

আবিষ্কারকেই জগদ্বাসীর অন্তরের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে, তাই এ সকল শুধু চোখে দেখিবার, আলোচনা করিবার বস্তু নয়—অন্তর দিয়া অনুভব করিবার মত পরম সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মরুভূমির বালুময় বিস্তারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মানুষ তাহাকে দুই পিরামিডের বিস্ময়চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে, নির্জ্জন দ্বীপের সমুদ্রতটকে মানুষ পাহাড়ের গায়ে কারুকৌশলপূর্ণ গুহা খুদিয়া চিহ্নিত করিয়াছে, বলিয়াছে ইহা আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করিল। এই চিহ্নই বোম্বাইয়ের হস্তী গুহা। পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া মানুষ সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যোদয়ের মহিমা দেখিল, অমনি বহু শতক্রোশ দূর হইতে পাথর আনিয়া সেখানে আপনার করযোড়ের চিহ্ন রাখিয়া দিল, তাহাই কনারকের মন্দির। সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়-রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে, অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে, সেইখানেই আপনার একটা চিহ্ন কাটিয়াছে। সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্ত্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্যেও এই চিহ্ন। বিশ্ব-জগতের যে কোন ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে, সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে—এমনি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য, উত্তরণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। এমনি করিয়া মানুষ জলে-স্থলে-আকাশে, শরতে-বসন্তে-বর্ষায়, ধর্ম্মে-কর্ম্মে-ইতিহাসে অপরূপ চিহ্ন কাটিয়া কাটিয়া সত্যের সুন্দরের মূর্ত্তির প্রতি মানুষের হৃদয়কে নিয়ত আহ্বান করিতেছে।"

মানুষের সৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যের প্রস্তরফলকে চিত্রাঙ্কন করিয়া চলিয়াছেন তাহার পথপ্রান্তের মানুষগুলির। তাঁহার সেই অঙ্কন প্রস্তরে অঙ্কন, তাই তাহা মুছিবার নয়। চিরদিনের জন্য সেই চিহ্ন চিরস্থায়ী হইয়া রহিবে।

পথপ্রান্তে কবির গৃহ। সে পথ দিয়া মানুষের নিয়ত আসা-যাওয়া। এই যাত্রীদল নিয়ত আসিতেছে ও যাইতেছে, তবুও তাহারাই কবির পরমাত্মীয়। কবির রচনায় তাহাদেরই ছায়া পড়িতেছে, কেন না কবির হৃদয়েও পড়িয়াছে সেই যাত্রাদলের চলমান ছায়া।

"আমার সম্মুখ দিয়া কত লোক আসে, কত লোক যায়। প্রভাতের আলো তাহাদেব আশীর্ব্বাদ কবিতেছে, স্নেহভবে বলিতেছে, 'তোমাদেব যাত্রা শুভ হউক।'* * প্রভাতে সমস্ত বিশ্বজগৎ শুভযাত্রাব গান গাহিতেছে। * * প্রভাত জগতেব আশা, আশ্বাস, প্রতি দিবসেব নান্দী।" * *

পথ-প্রান্তে

"আমাব লেখাব উপব ছায়া ফেলিয়া পৃথিবীর লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাবা সঙ্গে কিছুই লইয়া যায় না, তাহাবা সুখ দুঃখ ভুলিতে ভুলিতে চলিয়া যায়। তাহাদের হাসিকান্না আমাব লেখাব উপর পড়িয়া অঙ্কুবিত হইয়া উঠে।" * *

"আর কিছুই থাকে না, কিন্তু প্রেম তাহাদেব সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহাবা কেবল ভালবাসিতে বাসিতে চলে। পথেব যেখানেই তাহাবা পা ফেলে সেখানটুকুই ভালবাসে। সেইখানেই তাহাবা চিহ্ন বাখিয়া যাইতে চায়— তাহাদেব বিদায়েব অশ্রুজলে সে জাযগাটুকু উর্ব্বরা হইয়া উঠে। তাহাদের পথেব দুই পার্শ্বে নূতন নূতন ফুল ফুটিয়া থাকে। নূতন নূতন পথিককে ভাল-বাসিতে তাহাবা অগ্রসব হয। প্রেমেব টানে তাহাবা চলিয়া যায়। প্রেমেব প্রভাবে তাহাদেব প্রতি পদক্ষেপেব শ্রান্তি দূব হইয়া যায়। জগতেব শোভা জননীব স্নেহেব ন্যায় সমস্ত পথ তাহাদেব সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে।" * *

ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এই মানুষগুলি প্রেমেব টানে জীবনেব যাত্রাপথে চলিয়াছে। কিন্তু প্রেম কি বন্ধন?"

কবি ভাল কবিযাই জানেন যথার্থ প্রেম কখনও বন্ধনস্বরূপ হয় না। কবি নিজেও প্রেমেবই পূজাবী, তাই প্রেমেব গূঢ় কথা তিনি ভাল কবিয়াই জানেন। তিনি জানেন প্রেম কাহাকেও বাঁধিয়া বাখে না, কিন্তু প্রেমেব টানেই জগৎ চলিতেছে, যেমন গুণেব টানে নৌকা চলে। প্রেমই সংসাবকে সচল বাখিযাছে। বৃহৎ প্রেমেব প্রভাবে ছোট ছোট স্বার্থবজ্জুতে আবদ্ধ প্রেম ছিঁড়িযা যাইতেছে। অগ্রসবেব গতিকে সচল বাখিয়াছে এই বৃহৎ প্রেম, জগৎ তাই চলিতেছে, না হইলে আপনাব ভাবে অচল হইয়া পড়িত।

কবির রচনায় আছে নবপ্রভাতের কনক চুম্বনের চিহ্ন

পথপ্রান্তে কবির গৃহ, সে গৃহের বাতায়ন সকল সময়েই মুক্ত, সেই মুক্ত বাতায়ন পথে পথের দৃশ্যগুলি কবির মনোনেত্রে উদ্‌ভাসিত হইতেছে। কবি অবিরাম লেখনী চালনা করিয়া যাইতেছেন, শত শত পথিকের বিচিত্র জীবন-কাহিনী ফুটিয়া উঠিতেছে অক্ষরে অক্ষরে।

ভোরবেলায় নবোদিত সূর্য্যের প্রথম কিরণ অশোকছায়ার কম্পনকে সাথী করিয়া কবিকে অভিবাদন করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আবার কবির কোলের উপর আসিয়া পড়ে তাঁহার সঙ্গে খেলা করিবার জন্য, তাঁহার লেখার উপর পড়িয়া লেখাকে সোনার রঙে রঙিন করে, মনে হয় যেন লেখার উপর পড়িয়াছে নব-প্রভাতের কনক-চুম্বনের চিহ্ন। সেই লেখাকে বেষ্টন করিয়া লেখার চারিধারে প্রভাত ফুটিয়া উঠে। অন্ধকারের অবসান, নবীন আলোকের অভ্যুদয়। মাঠের ফুল, মেঘের রং, ভোরের বাতাস, আর সেই সঙ্গে একটুখানি ঘুমের ঘোরও লেখার খাতার পাতায় পাতায় মিশাইয়া থাকে। অরুণের প্রেম সেই খাতায় লেখা অক্ষরের চারিদিকে লতাইয়া উঠিয়া তাহাকে বেষ্টন করে।

মানুষের জীবনের কত না অপরূপ ছবি!

কবি বলিতেছেন, "পথিকেরা যখন চলে যায় আমি আমার বাতায়ন হইতে তাহাদের হাসি দেখি, কান্না শুনি। যে প্রেম কাঁদায় সেই প্রেমই আবার চোখের জল মুছাইয়া দেয়। হাসির আলো ফুটাইয়া তোলে। হাসিতে, অশ্রুতে, আলোতে, বৃষ্টিতে আমাদের চারিদিকে সৌন্দর্য্যের উপবন প্রফুল্ল করিয়া রাখে। প্রেম কাহাকেও চিরদিন কাঁদিতে দেয় না। যে প্রেম একের বিরহে তোমাকে কাঁদায় সেই প্রেমই আবার আর পাঁচকে তোমার কাছে আনিয়া দেয়—বলে, 'একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, যে গেছে ইহারা তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে।' কিন্তু তখন তুমি অশ্রুজলে অন্ধ, তখন আর কাহাকেও দেখিতে পাও না তাই ভালবাসিতে পার না। * * * তুমি পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাক, জগতের পথে যাত্রা করিতে চাও না। কিন্তু অবশেষে প্রেমের জয় হয়, প্রেম তোমাকে টানিয়া লইয়া যায়, তুমি মৃত্যুর উপরে মুখ গুঁজিয়া চিরদিন পড়িয়া থাকিতে পার না।"

প্রেমের হরণ ও পূরণ

রবীন্দ্রনাথ পথকে ভালবাসেন।

তিনি বলিয়াছেন, পথের উপর ভালবাসা না থাকিলে 'পথিক' হওয়া যায় না। প্রভাতে যাহারা প্রফুল্ল হৃদয়ে যাত্রা করিতে বাহির হয় তাহাদের অনেক দূর যাইতে হইবে,—অনেক—অনেক দূর! পথের উপর যদি তাহাদের ভালবাসা না থাকিত তবে তাহারা এ দীর্ঘ পথ চলিতে পারিত না। পথ ভালবাসে বলিয়াই প্রতি পদক্ষেপেই তাহাদের তৃপ্তি। পথ ভালবাসে বলিয়াই তাহারা চলে, আবার এই পথ ভালবাসে বলিয়াই তাহারা চলিতে চাহে না। প্রতিপদে তাহাদের ভ্রম হয়, 'যেমন পাইয়াছি এমন আর পাইব না'—কিন্তু অগ্রসর হইয়াই আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়। প্রতিপদে তাহারা শোক মুছিয়া মুছিয়া চলে।"

মা ছেলে বুকে লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে। ছেলেই তাহার সর্ব্বস্ব, ছেলের জন্যই তাহার গতি আবার স্থিতি।

কবি তাঁহার বাতায়ন হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া বলিতেছেন, "ওই দেখ, কচি ছেলেটিকে বুকে করিয়া মা সংসারের পথে চলিয়াছে। এই ছেলেটির উপরে মাকে কে বাঁধিয়াছে, ওই ছেলেটিকে দিয়া মাকে কে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।"

চলার পথ কণ্টকে পূর্ণ, কিন্তু কবি দেখিতেছেন, "প্রেমের প্রভাবে পথের কাঁটা মায়ের পায়ের তলে কেমন ফুল হইয়া উঠিতেছে। ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া পথকে গৃহের মত মধুর করিয়াছে কে?—কিন্তু হায়, মা ভুল বোঝে কেন? মা কেন মনে করে এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার আনন্দের সীমা। অনন্তের পথে যেখানে পৃথিবীর সকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, একটি ছেলে তার মায়ের হাত ধরিয়া মাকে সেই ছেলের রাজ্যে লইয়া যায়—সেখানে শতকোটি সন্তান। সেখানে বিশ্বের কচিমুখগুলি ফুটিয়া একেবারে নন্দন-কানন করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে স্খলিত মধুর ভাষার কল্লোল।"

"একটি ছেলে মায়ের কোলে আসিয়া মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া দেয়। যাহার ছেলে নাই তার কাছে অনন্ত স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ, ছেলেটি

আসিয়া স্বর্গের সেই দ্বারটি খুলিয়া দেয়। তারপর চলার পথে তুমি চলিয়া যাও, সেও চলিয়া যাক্। তার কাজ ফুরাইল, তার অন্য কাজ আছে।"

প্রেম তীর্থপথে পথের সাথীর মত, অনন্তের পথেও পথের সাথী। সেই আমাদের ডাকিয়া ডাকিয়া ঘর হইতে পথে বাহির করে।

কবির কথায় মনে হয় তিনি বাতায়নে বসিয়া অসংখ্য পথিকের পথ চলা দেখিতেছেন, কিন্তু তিনি তো দর্শকমাত্রই নহেন, তাঁহার মনটি যে অগ্রগামী হইয়াছে ওই পথিক দলেরই সঙ্গে। তিনি মনে প্রাণে জানেন যে, মানুষের জন্মই হইল পথিক জন্ম। তাঁহার অনুভূতি প্রতিক্ষণেই তাঁহাকে জানাইতেছে এই পথ চলায় প্রেমই পথের সাথী, প্রেমই চলার পথে এক হইতে আর একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। পথে অন্ধকার নামিলে প্রেমই হয় পথের আলো। পথে দুঃখ আছে, কাঁটার বনও আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটি মধুর অনুভূতিও আছে যে, "আমরা ঘর ছাড়িয়া পথে চলিতেছি কিন্তু তবু—আমরা ভালবাসিয়া চলিতেছি।"

প্রেমই অনন্তের পথে পথ প্রদর্শক

অনন্তের পথে অনন্ত পথিকদল, ইহারা তো কবিরই প্রাণের অংশ স্বরূপ। কবি বলিতেছেন, "আমি দেখিতেছি ভাবিতেছি, ভালবাসিতেছি। আমি পথিকদিগকে বলিতেছি, তোমাদের যাত্রা শুভ হউক। আমি আমার প্রেম তোমাদের পাথেয় স্বরূপে দিতেছি। কারণ, পথ চলিতে আর কিছুর আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে।"

মানুষের পরিচয় পাইতে হইলে সে কি জানে, তাহার জ্ঞানের পরিমাণ কতখানি ইহা জানিলেই যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। কিসে সে আনন্দ পায় ইহাতেই পাওয়া যায় তাহার প্রকৃত পরিচয়।

কবি বলেন, "যখন দেখি, সত্যের জন্য কেহ নির্ব্বাসন স্বীকার করিতেছে, তখন সেই বীরপুরুষের আনন্দের পরিধি আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেখিতে পাই, সে আনন্দ এত বড়ো জায়গা অধিকার করিয়া আছে যে নির্ব্বাসন দুঃখ অনায়াসে তাহার অঙ্গ হইয়াছে। এই দুঃখের দ্বারাই

আনন্দের মহত্ত্ব প্রমাণ হইতেছে। টাকার মধ্যেই যাহার আনন্দ, সে টাকার ক্ষতির ভয়ে অসত্যকে অপমানকে অনায়াসে স্বীকার করে, সে চাকরি বজায় রাখিতে অন্যায় করিতে কুণ্ঠিত হয় না—এই লোকটি যত পরীক্ষাই পাশ করুক, ইহার যত বিদ্যাই থাকুক, আনন্দশক্তির সীমাতেই ইহার যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের কতখানি আনন্দের অধিকার ছিল, যাহাতে রাজ্যসুখের আনন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, ইহা যখন দেখে, তখন প্রত্যেক মানুষ মনুষ্যত্বের আনন্দপরিধির এই বিপুলতা দেখিয়া যেন নিজেরই গুপ্তধন আবিষ্কার করে, নিজেরই বাধামুক্ত পরিচয় বাহিরে দেখিতে পায়। এই মহৎ চরিত্রে আনন্দবোধ করাতে আমরা নিজেকেই আবিষ্কার করি।

মানুষের প্রকৃত পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের দিক দিয়াই বিশেষ করিয়া 'মানুষ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য মানুষের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ, কিন্তু এই ছবি সব সময় সুস্পষ্টই নয়, অথবা যথাযথ নয় অনেকটা কল্পনার বর্ণনে অনুরঞ্জিত। স্বর্গীয় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপে এই আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে 'সাহিত্য' দুইভাবে আমাদের আনন্দ দেয়, এক, সত্যকে সে মনোহর রূপে আমাদের সম্মুখে চিত্রিত করে, আর, সে সত্যকে আমাদের গোচর করে। যে কোন লেখক যেখানে নিজের ভাবনার মধ্য দিয়া মানুষকে অনুভব করিয়াছেন; মানুষের আনন্দ ও বেদনা, এবং মানুষের দোষ ত্রুটি ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়া যে সমগ্র সত্তাটি বিকশিত হইতে চাহিতেছে সেইটিকেই অন্তরের দরদ দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন লেখকের চরিত্র অঙ্কন সেইখানেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের ভাব সেই চরিত্র অঙ্কনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ কত যে ব্যাকুল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হৃদয়ের ধর্ম্মই এই যে, সে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাঁচিয়া যায়। যে কথাটি প্রকাশ করা হইতেছে তাহা হয়তো বিশেষ মূল্যবান নয়। কিন্তু

প্রকাশটাই আমাদের কাছে একটা দুর্মূল্য ব্যাপার। *** সাহিত্যে মানুষ কেবল যে আপনার ভাবের প্রাচুর্য্যকেই প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা নয়, সে আপনার প্রকাশ-শক্তির উৎসাহ মাত্রকেই ব্যক্ত করিয়া আনন্দ করিতে থাকে। সাহিত্যে মানুষ কতই বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপকে—অমৃত রূপকে প্রকাশ করিতেছে, সাহিত্যের ইহাই সার্থকতা।" ** প্রাচুর্য্যেই মানুষের যথার্থ প্রকাশ। ** সেই জন্য সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য্য, যাহা ঐশ্বর্য্য যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই।"

প্রকাশের ভিতরেই মানুষের তৃপ্তি

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে সেই প্রকাশের দুইটি বিশেষ ধারা আছে। একটি ধারা মানুষের কর্ম্ম, আর একটি ধারা মানুষের সাহিত্য। এই দুই ধারাই একেবারে পাশাপাশি চলিয়াছে। *** কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ তাহার দেহ-মন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও অভিজ্ঞতা লইয়া গৃহ, সমাজ, রাজ্য ও ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছে। এই গড়ার মধ্যে মানুষ যাহা জানিয়াছে, যাহা পাইয়াছে, যাহা চায়, সমস্ত প্রকাশ পাইতেছে। ** এমনি করিয়া যাহা ভাবের মধ্যে ঝাপসা হইয়াছিল কর্ম্মের দ্বারা ভাবের মধ্যে তাহা আকারে জন্ম লইতেছে। যাহা একের মধ্যে ক্ষীণ হইয়াছিল তাহা অনেকের মধ্যে নানা অঙ্গবিশিষ্ট বড় ঐক্য পাইতেছে। ক্রমে এমন হইয়া উঠিতেছে যে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষ এই বহুদিনের ও বহুজনের গড়া ঘর, সমাজ, রাজ্য ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া ছাড়া নিজেকে স্পষ্ট করিয়া, পুরা করিয়া প্রকাশ করিতেই পারে না। এই সমস্তটাই মানুষের কাছে মানুষের প্রকাশরূপ হইয়া উঠিয়াছে। * এই জন্য সভ্য সমাজে রাজ্যে আঘাত লাগিলে সেই রাজ্যের প্রত্যেক লোকের সমষ্টিগত কলেবরে আঘাত লাগে। সমাজ কোনদিকে সঙ্কীর্ণ হইলে সেই সমাজের প্রত্যেক লোকের আত্মপ্রকাশ আচ্ছন্ন হইতে থাকে। মানুষের সংসার ক্ষেত্রের এই সমস্ত রচনা যে পরিমাণে উদার হয় সেই পরিমাণে সে

আপনার মনুষ্যত্বকে অবাধে প্রকাশ করিতে পারে। যে পরিমাণে সেখানে সঙ্কোচ আছে, প্রকাশের অভাবে মানুষ সেখানে সেই পরিমাণে দীন হইয়া থাকে।"

কর্মক্ষেত্রে মানুষের আত্মপ্রকাশ—রবীন্দ্রনাথের মতে এখানে প্রকাশটা গৌণ ফল মাত্র, গঠন কর্মকে সম্পূর্ণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি তুলনার দ্বারা বুঝাইয়াছেন, "গৃহিণী ঘরের কাজের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু সেই প্রকাশ করাটাই তাঁহার মনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য নয়, গৃহকর্মের প্রয়োজন-সাধনের ভিতর দিয়া যেটুকু তাহার আত্মপ্রকাশ, সেই টুকুই মাত্র আমরা দেখিতে পাই।"

বাহিরকে অন্তরতম করাই মানব হৃদয়ের ধর্ম্ম

"ইহার কারণ এই যে মানুষ নিজেকে নিয়া নিজে পরিপূর্ণ নয়। তাহার সকল চেষ্টা সকল আবেগ বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া তবেই সে নিজের সম্পূর্ণত্ব অনুভব করে। * * যে বাড়িতে সে বাস করে সে বাড়ি তাহার কাছে কেবল ইটকাঠে গড়া আস্তানা মাত্র নয়, সে বাড়ি তাহার বাস্তুভূমি, তাহার হৃদয়ের ভাবরসে অভিষিক্ত পুণ্য স্থান। যে দেশে সে বাস করে সে দেশ তাহার কাছে ভৌগোলিক ভূমিখণ্ড মাত্র বা মাটিজল আকাশ হইয়া থাকে না, সেই দেশ তাহার কাছে ঈশ্বরের জীবধাত্রীরূপে, জননীরূপে প্রকাশিত হইলে তবে সে আনন্দ পায়। মানুষের হৃদয় আপনাকে বিলাইয়া দিতে না পারিলে বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে না পারিলে আনন্দ ও উৎসাহহীন উদাসী হইয়া মৃত্যু পথের পথিক হয়।"

কবি বলিয়াছেন, "বাহিরকে অন্তরের এবং অন্তরকে বাহিরের সামগ্রী করিবার একান্ত ব্যাকুলতাই মানব-হৃদয়ের ধর্ম্ম।"

কর্মের মধ্য দিয়া মানুষ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে চায়, কিন্তু যে কর্ম্ম ভাবের উৎস হইতে নির্ঝরের মত আপনার আবেগে আপনি গতিশীল না হয় সে কর্ম্মের সার্থকতা কি।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ভাব ও কর্ম্মের সংযোগই সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র। রসের সম্বন্ধ যেখানে আছে সেখানে আদান প্রদান আছে। আমাদের

হৃদয়লক্ষ্মী জগতের যে কুটুম্ব বাড়ি হইতে যেমন সওগাত পায়, সেখানে তাহার অনুরূপ সওগাতটি পাঠাইতে না পারিলে তাহার গৃহিণীপনায় যেন ঘা লাগে। এইরূপ সওগাতের ডালায় নিজের কুটুম্বিতাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে নানা মালমশলা লইয়া, স্বর লইয়া, তুলি লইয়া, ভাষা লইয়া, পাথর লইয়া সৃষ্টি করিতে হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার নিজের কোন প্রয়োজন সারা হইল তো ভালই, কিন্তু অনেক সময় সে আপনার প্রয়োজন নষ্ট করিয়াও কেবল নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র। সে দেউলে হইয়াও আপনাকে ঘোষণা করিতে চায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এই যে প্রকাশের বিভাগ,—ইহাই তাহার প্রধান বাজে খরচের বিভাগ—এইখানেই বুদ্ধি-খাজাঞ্চিকে বারংবার কপালে করাঘাত করিতে হয়।"

কবি বুদ্ধিকে 'খাজাঞ্চি' বলিয়াছেন, কেননা আয় ব্যয়ের হিসাবের ভার তাহারই উপর। লাভ ও ক্ষতি বুদ্ধিই খতাইয়া দেখে। মানুষের সম্বন্ধে নির্ব্বোধ কেহ বলিতে পারে না, তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কর্ম্মে বুদ্ধিই তাহার পরিচালক ও সহায়, তাহার স্বার্থরক্ষার সকল দিকের বিচারের ভার বুদ্ধিই গ্রহণ করে। বিশ্বজগতে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় অতি কঠিন ব্যাপার, ইহার ভিতর পদে পদে বাধা আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এই বাধা কাটাইবার খাটুনিতেই বুদ্ধি বিজ্ঞান দর্শনের মধ্যে নিজেকে খুব নিবিড় করিয়া অনুভব করে—তাহাতেই তাহার গৌরব বাড়ে। বস্তুত ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বিজ্ঞান দর্শন আর কিছুই নহে, বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধির নিজেকেই উপলব্ধি। সে নিজের নিয়ম যেখানে দেখে, সেখানে সেই পদার্থকে এবং নিজেকে একত্র করিয়া দেখে। ইহাকেই বলে বুঝিতে পারা, এই দেখাতেই বুদ্ধির আনন্দ। নহিলে আপেল ফল যে কারণে মাটিতে পড়ে, সূর্য্য সেই কারণেই পৃথিবীকে টানে এ কথা বাহির করিয়া মানুষের এত খুশী হইবার কোন কারণ ছিল না। টানে তো টানে, আমার তাতে কী? আমার তাহাতে এই যে, জগৎ-চরাচরের এই ব্যাপক ব্যাপারকে আমার বুদ্ধির মধ্যে পাইলাম,—সর্ব্বত্রই

বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের মধ্য দিয়া বুদ্ধির নিজেকেই উপলব্ধি

আমার বুদ্ধিকে অনুভব করিলাম। আমার বুদ্ধির সঙ্গে ধূলি হইতে সূর্য্য-চন্দ্র-তারা সবটা মিলিল। * * সমস্তের সঙ্গে বুদ্ধির এই মিলনই জ্ঞান। এই মিলনেই মানুষের বোধশক্তির আনন্দ।"

"মানুষ প্রতিদিন যাচ্ছে এবং আসছে। তাই মানুষকে আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখি, ভুলে যাই এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করবার জন্যই আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে বদ্ধ করে রেখে দেয়। তাই তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিবকাল অনুভব করতে পারি।"

কবির মতে এইভাবে চির মানুষেব সঙ্গ লাভেই অলক্ষিত ভাবে আমাদের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বেব বিকাশ হয়।

তাই, কেবল বিজ্ঞান দর্শনে পবিপূর্ণ মানুষ তৈবী হয় না, কিন্তু কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈবী হ'তে পাবে, ইহাই ববীন্দ্রনাথেব অভিমত।

কবি দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'গেটেব' উল্লেখ কবিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, "গেটেব উদ্ভিদ তত্ত্বেব গ্রন্থে উদ্ভিদ বহস্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গেটেব কিছুই প্রকাশ পায় নি, অথবা সামান্য এক অংশ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গেটে যে সকল সাহিত্য বচনা কবেছেন তাব মধ্যে মূল মানবটি প্রকাশ পেয়েছেন, বৈজ্ঞানিক গেটেব অংশও অলক্ষিতে মিশ্রিত ভাবে তাব মধ্যে আছে।"

সাহিত্যের জন্ম

ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাহিত্যে লেখকেব নিজেব অন্তবে একটি যে মানব-প্রকৃতি আছে এবং লেখকেব বাহিবে সমাজে যে একটি মানব-প্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতা সূত্রে, প্রীতি সূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়েব সম্মিলন হয়। এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ কবে। সেই সকল প্রজাব মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিবেব মানব-প্রকৃতি দুই-ই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনই জীবন্ত সৃষ্টি হ'তে পাবে না।"

"সাহিত্যেব প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে মানবজীবনেব সম্পর্ক। মানুষেব মানসিক জীবনটা কোন্‌খানে? যেখানে আমাদেব বুদ্ধি ও হৃদয়, বাসনা

এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গলে গিয়ে মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করেছে।"**

"এক কথায় যেখানে আদত মানুষটি আছে সেইখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়।"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড অংশগুলি বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি রচনা করে। পর্য্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।"

রবীন্দ্রনাথ সেক্সপিয়ার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "সেক্সপিয়ারের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত্ত ভাবশরীরী সেক্সপিয়রকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বিরাগ, অনুরাগ, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মত চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শিখায় বিচিত্র বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে।"

"লেখাপড়া, দেখাশোনা, কথাবার্ত্তা, ভাবাচিন্তা সব সুদ্ধ জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে, পরের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে একটা মোট সত্য পাই। সেইটিই আমাদের জীবনের মূল সুর। সমস্ত জগতের বিচিত্র সুরকে আমরা সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিই এবং আমাদের সমস্ত জীবন-সঙ্গীতকে সেই সুরের সঙ্গে বাঁধি। সেই মূল তত্ত্ব অনুসারেই আমরা সংসারে বিরক্ত অথবা অনুরক্ত, স্বদেশ বদ্ধ অথবা সার্ব্বভৌমিক, পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক, কর্ম্মপ্রিয় অথবা চিন্তাপ্রিয়। আমার জীবনের সেই মূল তত্ত্বটি, জগতের সমস্ত সত্য আমার জীবনের মধ্যে সেই যে একটি জীবন্ত ব্যক্তিগত পরিণতি লাভ করেছে সেইটি আমার রচনার মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা আত্মাস্বরূপে গূঢ়ভাবে বিরাজ করবেই। আমি গীতিকাব্যই লিখি আর যাই লিখি, কেবল তাতে যে আমার ক্ষণিক মনোভাবের প্রকাশ হয় তা নয়, আমার মর্ম্ম সত্যটিও তার মধ্যে আপনার ছাপ দেয়।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "শেলি বল, কীটস্ বল, টেনিসন্ বল সকলের রচনাতেই রচনার ভালমন্দের মধ্যেও একটি মর্ম্মগত মূল জিনিস আছে, এবং তারই উপর ঐ সকল কবিতার ধ্রুবত্ব ও মহত্ত্ব নির্ভর করে।"

কবি বলেছেন, "সেক্সপিয়ারে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই। কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্য্যন্ত আলোড়িত করে সেক্সপিয়ার তার সমস্ত মনুষ্যত্ব অবারিত করে দিয়েছেন। তার চোখের জল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হ'যে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্ছে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে কেবল মুক্তাদন্ত-গুলিকে মাত্র বিকাশ করছে না—কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মত অবাধে ঝরে আসছে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রীড়াশীল উৎসের মত প্রমোদে ফেটে পড়ছে। তার মধ্যে একটা উচ্চ-দর্শন-শিখর আছে যেখান থেকে মানব প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।"

কবি এইখানে বলিয়াছেন, "আমি যতই আলোচনা কর্‌ছি ততই অনুভব কর্‌ছি—সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।"

"যে দিক দিয়াই দেখি না, আমরা মানুষকেই চাই। সাক্ষাৎ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে। মানুষের সম্বন্ধে কাটা ছেঁড়া তত্ত্ব চাই না মূল মানুষটিকেই চাই। তার হাসি চাই, তার কান্না চাই, তার অনুরাগ বিরাগ আমাদের হৃদয়ের পক্ষে রৌদ্র বৃষ্টির মত।"

"লোকালয়ের পথ দিয়া চলিতে চলিতে আমরা শতসহস্র মানুষকে দেখি। দেখি মানুষের অবকাশ নাই। মুদি দোকান চালাইতেছে, কামার লোহা পিটিতেছে, মজুর বোঝা লইয়া চলিয়াছে; বিষয়ী আপনার খাতায় হিসাব মিলাইতেছে, সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস চোখে হয়তো দেখা যায় না, কিন্তু একবার মনে মনে দেখ,—রাস্তার দুইধারে ঘরে ঘরে দোকানে-বাজারে অলিতে-গলিতে কত শাখায়-প্রশাখায় রসের ধারা কত পথ দিয়া কত মলিনতা, কত সংকীর্ণতা, কত দারিদ্র্যের উপর কেবলই আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। রামায়ণ-মহাভারত কথা-কাহিনী কীর্ত্তন-পাঁচালী বিশ্বমানবের হৃদয় সুধাতে প্রত্যেক মানবের কাছে দিনরাত বাঁটিয়া দিতেছে, নিতান্ত তুচ্ছলোকের ক্ষুদ্র কাজের পিছনে রামলক্ষ্মণ আসিয়া দাঁড়াইতেছেন, অন্ধকার বাসার মধ্যে পঞ্চবটী বনের করুণামিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে; মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি, হৃদয়ের প্রকাশ,—মানুষের

কর্মক্ষেত্রের কাঠিন্য ও দারিদ্র্যকে তাহার সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের কঙ্কন পরা দুটি হাত দিয়া বেড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত সাহিত্যকে সমস্ত মানুষের চারিদিকে একবার এমনি করিয়া দেখিতে হইবে। * * তাহার বর্ষার চারিদিকে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত, কত বিদ্যাপতি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, তাহার ছোট ঘরটির সুখদুঃখকে সে কত চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সুখদুঃখের কাহিনীর মধ্যে বড়ো করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ঘরের মেয়েটিকে ঘিরিয়া গিরিরাজকন্যার করুণা সর্বদা সঞ্চরণ করিতেছে, কৈলাসের দরিদ্র দেবতার মহিমার মধ্যে সে আপনার দারিদ্র্য-দুঃখকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে; এইরূপে অনবরত মানুষ আপনার চারিদিকে যে বিকিরণ সৃষ্টি করিতেছে তাহার বাহিরে যেন নিজেকে নিজে ছাড়াইয়া নিজেকে নিজে বাড়াইয়া চলিতেছে। যে মানুষ অবস্থায় দ্বারা সংকীর্ণ, সেই মানুষ নিজের ভাবসৃষ্টি দ্বারা নিজের এই যে বিস্তার রচনা করিতেছে, সংসারের চারিদিকে তাহা একটি দ্বিতীয় সংসার, তাহাই সাহিত্য।”

কবি যাহা বলিয়াছেন,—তাহার ভাবার্থ এই যে, একজনের দেখা আর একজনের দেখার সঙ্গে, এককালের দেখা আর এককালের দেখার সঙ্গে পরখ করিয়া মিলাইয়া লইবার সুযোগ পায় মানুষ বিজ্ঞানের স্মৃতি-ভাণ্ডারে। সেইরূপ বিশ্বসাহিত্যের রাজপথের অনুশরণ করিলে সমস্ত মানুষ হৃদয় দিয়া কালে কালে কি চাহিয়াছে ও কি পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সাহিত্য ও মানুষের হৃদয় এক ও অভেদ হইযা গিয়াছে, এবং একের ভিতরে অপরের প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে চরিত্র-অঙ্কন

নাটকে অঙ্কিত চবিত্রেব ভিতব দিয়া নাট্যকাবেবও সংস্পর্শ লাভ কবা যায়। গিবিশচন্দ্র বহু নাটক বচনা কবিয়াছেন এবং বিভিন্ন ভাবেব চরিত্র অঙ্কিত কবিয়াছেন। পাত্র ও পাত্রীগণেব মুখ দিয়া তিনি যে সকল উক্তি কবিয়াছেন, তাহাব ভিতব যে তাঁহাব নিজেব উক্তিও প্রচ্ছন্ন আছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিব উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। তাঁহাব সামাজিক নাটকগুলিতে আছে সামাজিক সমস্যাব চিত্র, সেই সঙ্গে সেই সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিতও আছে। কন্যাদায়গ্রস্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ এবং কতকগুলি বিবাহিতা ও বিবাহযোগ্য কন্যা কি দারুণ যন্ত্রণা সহ্য কবেন "বলিদান" নাটকটি তাহাবই একটি বাস্তব চিত্র। গ্রন্থশেষে ঘনশ্যামেব উক্তিব ভিতব দিয়া আমবা গ্রন্থকাবেব এই মন্তব্যটি পাই,—

"আমাদেব সমাজে আজ কন্যাব পিতাব এই পবিণাম, ঘবে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা। কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পবিত্যক্তা। প্রতি গৃহে দারিদ্র্য। সকলেব চক্ষেব উপব এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিবাজমান!—তথাপি আমরা পুত্রেব শুভবিবাহে কন্যাব পিতাকে পীড়ন কবিতে পবাঙ্মুখ হই না।"

সেই পীডন গত যুগে যেভাবে ছিল, এখন অবশ্য ঠিক সেইভাবে নাই, কেননা এখন নির্দ্দিষ্ট বয়সেব মধ্যে বিবাহ না দিলে ই জাতি যাইবে ইহাই শাস্ত্রেব উক্তি, একথা কেহই মানেন না। যাহা হউক সে-কালেব যে-চিত্র গিবিশচন্দ্র দিয়াছেন, তাহা হইতে সামান্য কিছু এখানে উদ্ধৃত কবিতেছি।

কন্যার পিতৃগৃহ। কন্যার সহিত একটি ঝিকে তাহাব শ্বশুববাডি পাঠানো হইয়াছিল, সেই ঝিটি ফিবিয়া আসিয়াছে দেখিয়া কন্যায় মাতা ভীতা হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি হয়েছে? তুই চলে এলি কেন?"

ঝি। "হবে কি গো? নাচ্‌তেছে—নাচ্‌তেছে! গালে মুয়ে চড়াচ্ছে—মড়াকান্না কাঁদ্‌তেছে।"

কন্যার মাতা। "ও বাছা—ব্যগ্রতা কবি, সব বল্‌, ক'নে কি তাদেব পছন্দ হয়নি?"

ঝি। "বল্‌বো,—তবে শুন্‌বে? পাল্কী খুলে, বউয়েব মুখ দেখে তোমাব বেয়ান অমনি ডুক্‌বে কেঁদে উঠ্‌লো। বলে, "ওমা, কোথাকাব কাটকুড়ুনি এলো গো—কোথাকাব হা'ঘবেব মেয়ে আনলুম গো—আমাব মোহিতেব বরাতে এই ছিল গো—কর্ত্তা কোথা গেল গো—একবাব এসে দেখ গো—তোমাব সাধেব মোহিত বাগ্দিনী এনেছে গো—তোমাব মোহিতকে ডোম্‌ ডোক্‌লা বিদেয় করেছে গো।" ইত্যাদি—

গিবিশচন্দ্রেব এই বর্ণনা বিন্দুমাত্র অতিবঞ্জিত নয়, ৪০।৫০ বৎসব পূর্ব্বেব এটি একটি প্রত্যক্ষ সামাজিক চিত্র।

"শাস্তি কি শান্তি" নাটকটি আব একটি সামাজিক চিত্র। এটি হিন্দু সমাজের বিধবা, বালিকা বিধবাব উপব সামাজিক অনুশাসন এবং পদস্খলিতা বিধবাব সমস্যা লইয়া লিখিত।

এই পুস্তকে তিনটি বিধবাব চিত্র আছে, একটি বিধবা তপস্বিনী, আব একটি বালিকা বিধবা, পিতা তাহাকে যে পাত্রেব সহিত দ্বিতীয়বাব বিবাহ দিয়াছিলেন, সে অতি কুচবিত্র, অর্থেব জন্য স্ত্রীকে কুচবিত্র ধনবানেব হস্তে সমর্পণ কবিতেও তাহাব কুণ্ঠা নাই, এবং ষড়যন্ত্র কবিয়া সে সেইরূপই কবিতে চাহিয়াছিল। আর একটি বিধবা স্বামীর বন্ধুব প্রলোভনে পতিত হইয়া অবৈধ সন্তানেব জননী হইয়াছিল এবং শেষে পিতাব হস্তেই তাহাকে মৃত্যু বরণ কবিতে হয়।

এই গ্রন্থে হবমণি নামে এক মহিলার কথা আছে, তিনি অনাথদিগেব জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আশ্রম পতিতা অথবা পবিত্রা

আবাসহীনা নির্য্যাতিতা নারীমাত্রেরই আশ্রয়-স্থল ছিল। আত্মহত্যায় উদ্যতা একজন পতিতাকে তিনি এই বলিয়া আত্মহত্যায় নিবৃত্ত করেন, "তুমি কিছু ভেব না। পাপ যদি করে থাক, সৎকার্য্য করে কুকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত কর। এখনো দেহ আছে, অনেক কাজ করতে পারবে। তোমার নিজের অবস্থার অন্য অভাগিনীদের তুমিই আশ্রয় হবে। তাতেই ভগবানের কৃপায় তোমার তাপিত হৃদয় শান্ত হবে।"

"ভ্রান্তি" নাটিকাটিকেও এক হিসাবে সামাজিক নাটক বলা যায়। এই নাটকে 'রঙ্গলাল' নামে একটি চরিত্র আছে। গঙ্গা নামক একটি বারবণিতা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "তোমায় আমি বুঝতে পারলুম না। পড়াশুনাও কর, বাবুয়ানাও কর, ইয়ারকীও দাও, চিকিৎসাপত্রও ক'রে থাক, বে' থাও করনি, খবর নিয়ে জেনেছি. মেয়েমানুষের কাছেও যাও না। দান, ধ্যানও কর, এদিকে পূজা-অর্চনার ধারও ধার না।"

গঙ্গা, রঙ্গলাল তাহাকে চিনিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে রঙ্গলাল যখন উত্তর করিলেন যে, তিনি চিনিতে পারেন না, তখন গঙ্গা তাহাকে বলিয়াছিল, "আজ ক' বছরের কথা, আমি ঠাকুরতলায় সর্দ্দিগর্ম্মি হ'য়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি, বেশ্যা বলে ঘৃণা করে কেউ মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে এনে তোমার বাড়িতে নিয়ে এলে। আপনি নীচে শুয়ে নিজের বিছানায় জায়গা দিলে। যে যত্ন করলে, ভালোবাসার লোকও সে রকম করে না। তারপর যখন ভালো হয়ে আমি বাড়ি যাই, তুমি যেন আমায় চেনই না।"

ইহাই রঙ্গলালের চরিত্র।

রঙ্গলালের মিথ্যা কথা বলিতেও সংস্কারে বাধে না, যদি সে মিথ্যা অন্যের উপকারের জন্য প্রয়োজন হয়।

রঙ্গলাল প্রহবীদিগকে ভুলাইয়া শালিগ্রাম সিংহ ও তাহাব পুত্র নিরঞ্জনকে কারাগার হইতে মুক্ত কবিলেন, কিন্তু নিজে ধবা দিলেন, পাছে সেই নির্দোষ প্রহবীদেব দণ্ড হয়। তিনি গঙ্গাকে দিযাই প্রহবীদেব ভাং খাওয়াইয়া ছিলেন, আবাব মুক্ত হইয়া গঙ্গাকে সম্মুখে দেখিয়া অপব একটি বালিকাকে বক্ষা কবিবাব জন্য যখন তাহাব সাহায্য চাহিলেন, তখন গঙ্গা তাহাকে বলিল, "আচ্ছা, তোমাব পবেব জন্য এত মাথা ব্যথা কেন? এদিকে তো ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই মান না, সামনে দেবীমন্দিব, মায়েব সামনে একবাব মাথাটাও নোয়ালে না।"

রঙ্গলাল বলিলেন, "মায়েব কোলে ছেলে থাকে, ক'বাব প্রণাম কবে বল। ক'বাব স্তবস্তুতি কবে? ক'বাব বলে তুমি হ্যান, তুমি ত্যান?"

বঙ্গলাল আবও বলিলেন, "অমন পাথুবে মাকে মানি না মানি, তাতে বড় এসে যায় না।...আমি বলি—থাক মা, বিল্বপত্রেব গাদায়, টিকিদাস ভট্‌চার্য্যিব মুখে চিড়িং চাড়াং ফিডিং ফাডাং শোন।"

গঙ্গা যখন জিজ্ঞাসা কবিল, "তুমি নাস্তিক নাকি?"

তখন বঙ্গলাল বলিলেন, "আমি নাস্তিক? যে আমায় নাস্তিক বলে সেই নাস্তিক। আমি অমন অন্ধকাবে তীবন্দাজী কবি না, আমাব দেবতা প্রত্যক্ষ।..মানুষ আমাব দেবতা। যাবে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান বলে ভগবানেব অংশ। 'শাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক আছে, এ কথাব তর্কবিতর্ক নাই। আমাব দেবতা প্রাণময় মানুষ,—মন্ত্র পডে যাব প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কবতে হয় না,—যাব সেবায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয়,—যাব সেবা কবে মনকে জিজ্ঞাসা কবতে হয় না—ভালো করেছি কি মন্দ কবেছি—যে দেবতাব পূজায কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই।"

ইহাই রঙ্গলালেব উক্তিব ভিতব দিযা গিবিশচন্দ্রেব উক্তি এবং তাঁহাব গুরু ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দেবও উক্তি।

বঙ্গলাল তাঁহাব ব্যক্তব্যটি বিশেষ কবিয়া বুঝাইয়া বলিবার জন্য বলিলেন, "পুণ্যেব ফলে স্বর্গসুখ হয় এ কথা শুনেছ তো। দেখ, একদিন একজনকে—যার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, চাবটি খেতে দিও, যার খুব তেষ্টা পেয়েছে তাকে

একটু জল দিও—খেয়ে ব্যাটাবা 'আঃ' ক'রবে, শুনে তোমাব যে সুখ হবে, কোনও ব্যাটাব চোদ্দপুরুষে কল্পনায় স্বর্গ সৃষ্টি ক'বে এত সুখ কল্পনাও করতে পাবে নি।"

ইহাই বঙ্গলালেব প্রকৃত সুখেব কল্পনা। বইখানিব নাম "ভ্রান্তি", লোকে ভুল বুঝিয়া কত কি অন্যায় কবে, ইহাব পবিচয় এই পুস্তকেব পাতায় পাতায় আছে। বইযেব শেষ দিকে নিবঞ্জন যখন ভুল বুঝিবাব জন্য বন্ধু পুবঞ্জনকে অস্ত্রাঘাত কবিল, এবং ভ্রান্তিব অবসানে, "ভাই, ভাই নিবস্ত্র তোমায় বধ কবলেম" বলিযা বিলাপ কবিতে আবম্ভ কবিল, তখন বঙ্গলাল তাহাকে বলিলেন, "তা কবেছ-কবেছ, এখন যদি কোন বকমে বাঁচে তাব চেষ্টা কব না, তাতে তো আব তত আপত্তি নাই। আর একটি কাজ কর, উন্মত্ত সৈন্যদেব অত্যাচাব নিবাবণ কব। পুবঞ্জন আহত, তুমিই এ কার্য্যেব ভাব লও।"

"হাবানিধি" নাটকে অনেকগুলি চবিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাব ভিতর শয়তানরূপী মোহিনীব চবিত্রে বিশেষ দৃঢতা আছে। গুরুতব অন্যায় কবিযাও তাহাব বিন্দুমাত্র অনুতাপ হয না। সে তাহাব স্ত্রীকে বলে, "তুমি ছোট ঘবেব মেয়ে, বডলোক কেমন কবে হয় জান না। সাতহাত মাটি কোদ্লাও একটা পয়সা পাবে না, ক্রোব টাকাব সম্পত্তি কি অমনি হয়? গ্রাম জ্বালিয়ে প্রজা শাসন কবতে হয়, গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিতে হয়, নাতোযানেব বিষয কেডে নিতে হয়—তবে বডলোক হয়। তুমি এসব জান মা, যেমন জান না, আমি জানতে বলি নি—ঘবে ব'সে খাও দাও থাক, মেয়েটাকে উচ্ছন্ন দিও না, এই আমাব কথা। আমি চোখ বুজলে মেয়েবই বিষয় হবে, তুমি যদি ওকে দয়া, ধর্ম্ম, শাপ মন্নি শেখাও, তা হ'লে এই অট্টালিকা দেখছো—দু'দিনে মাঠ হবে।"

মোহিনী তাহার আবাল্য বন্ধু হবিশকে ষড়যন্ত্র করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। হবিশ যখন তাহাব উদ্দেশ্য বুঝিতে পাবিল, তখন মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "তুমি সবই কি ভুলে গেলে? তুমি সাঁতাব দিতে দিতে জলে ডুবে যাও, আমি আপনাব প্রাণেব মায়া না কবে তোমায় বাঁচাই,—তোমাব মার গহনা চুবি কবেছিলে, তোমাব বাপ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, আমি তোমায় মুখেব খাবার খাওয়াই। তোমাব কষ্ট হবে ব'লে তোমায় বিছানা ছেড়ে দিয়ে মাদুবে শুই, হাড়ীপাড়ায় দাঙ্গা কবেছিলে, তোমায় বাঁচবাব জন্য তোমায় আগলে হাড়ীব লাঠি খেয়ে ছ'মাস শয্যাগত থাকি, এখনও আমাব গায়ে লাঠির দাগ আছে। আমি বিশ্বাস কবে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি, আব তুমি গলায় ছুবা দিচ্ছ?"

উত্তরে মোহিনী বলিল, "তুমি মূর্খ, তুমি কথামালাও পড়নি? বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিল; তুমি কি জান না, সাবস বাঘেব মুখ থেকে নিজেব মাথা বাব করে এনেছিল এই ঢেব! গবিবলোকের আব কাজ কি? বড়লোকেব জন্য মাথা দেবে, বড়লোকেব জন্য মেয়েমানুষ যোগাবে, কুকুবেব মত দুটি খাবে আব থাকবে।"

এই মোহিনীর একমাত্র দুর্ব্বলতা কন্যাব প্রতি স্নেহ। কন্যাব জননী তাই কন্যাকে দিয়াই স্বামীব নিকট যত কিছু আবেদন পাঠান। মোহিনী হবিশেব বাস্তুভিটা গ্রাস কবিয়া তাহাকে উঠাইযা দিতেছে তাই কন্যাকে জানাইলেন যে, "তোব হ্যাখন্-মাসীদেব বাড়ি ভাঙ্গিয়া কর্ত্তাবাবু তাহাদেব তাড়াইয়া দিবেন।"

সবলা বালিকা পিতাকে কর্ত্তাবাবু বলিয়া ডাকে এবং শোনা কথা মুখস্থ কবিয়া পাকা পাকা কথা বলে। তাহাব মুখে সেই সকল কথা শুনিযা মোহিনীর কঠিন চিত্তও যেন মুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু গৃহিণীব উপব বাগিয়া যায় যে মেয়েকে সে দয়া মায়া প্রভৃতি শিখাইতেছে।

মায়ে মেয়েব পরামর্শ হইতেছিল মোহিনীমোহন আসিতেছে দেখিয়া পত্নী কমলা ত্রস্তা হইলেন, কন্যাব বাক্যপ্রবাহে বাধা দিয়া বলিলেন, "চুপ কর!"

হেমা। চুপ্ করব কি গো? আমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ নেই, স্পষ্ট কথা বলব।

মোহিনীমোহন প্রবেশ করিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে ক্ষেপী, কি রে?"

হেমা। কর্ত্তাবাবু তুমি দেখনহাসি মাসিদের উঠিয়ে দিও না, আমি একটা অগস্ত্যে অবধ্যে প'ড়ে আছি, আমারও তো মুখ চাইতে হয়। আমি নানান জ্বালায় ঘুরি - সুশীলা দিদির সঙ্গে কথা ক'য়ে তবু একটু জুড়ুই।

মোহিনী। তোরে কে বল্লে রে? কে বল্লে রে?

হেমা। হুঁ! তোমায় বলে আমি থানা-পুলিস করি আর কি!

মোহিনী। (কমলাকে দেখাইয়া) এ বলেছে?

হেমা। হ্যাঁ, তোমায় পেটের কথা ভাঙি, তুমি মার গর্দ্দান নাও! কর্ত্তাবাবু, তোমায় বলছি বাছা, তুমি কিন্তু দেখনহাসি মাসীদের গায়ে হাতটা দিতে পারবে না।

মোহিনী। না, না, কে বল্লে? মিছে কথা। যা, শুগে যা।

হেমা। যাচ্ছি বাপু। দেখ, যেন তাদের নাইতে কেশটি না ছেঁড়ে।

মোহিনী। ক্ষেপি, আমায় চুমু খেয়ে গেলিনি?

হেমা। বাছারে, যত বুড়ো হচ্ছি যেন ভীমরথী হচ্ছে। (চুমো খাইয়া) আসি, বাছা। ভাল কথা মনে—কর্ত্তাবাবু একটা টাকা দাও, বেইবাড়ি তত্ত্ব করতে পাচ্ছিনি, বর কনে ঘরে আনতে পাচ্ছিনি।

মোহিনী। (টাকা দিয়া) এই নে, এই নে যা।

হেমা। 'যা' বাক্যি বলতে আছে? বল এস।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলে মোহিনীমোহন স্ত্রীকে তিরস্কার করিতে লাগিল, অবশেষে প্রহারও করিল। হেমাঙ্গিনী ঘুমায় নাই, পিতার ক্রুদ্ধ চিৎকার ও প্রহারের শব্দ শুনিয়াই ছুটিয়া আসিল, বলিল, "ও কর্ত্তাবাবু কি করলে, কি করলে, মা মরে যাবে, মা মরে যাবে। আমায় মেরে ফেল, কর্ত্তাবাবু, আমায় মেরে ফেল।"

এইভাবের অনেক কথাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতাকে বলিল। এবং

পিতা চলিয়া গেলে মাকে জডাইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যে সকল কথা বলিতে লাগিল তাহাব ভাবার্থ এইরূপ—"ও—মা, তুই আমাব মাথা খেয়ে কেন এলি মা? আমি কেঁদে কেঁদে বাঁচব না মা, মা তুই আমায ভাঁডাস্‌নি মা, আমি দেখেছি মা তোকে বড্ড মেবেছে, মা তোব গতব ভেঙ্গে দিয়েছে মা। ও মা, তুই বড দুঃখী মা! ওগো মাগো, তুই কেন হেথা এয়েছিলি গো, আমাব বুক ফেটে যাচ্ছে গো, আমাব দুঃখিনী মাকে কেন কর্ত্তাবাবু মাবলে গো?"

এই কন্যা হেমাঙ্গিনীব জন্যই শেষে মোহিনীমোহনেব চবিত্রেব পবিবর্ত্তন হইয়াছিল।

এই সব নাটকে ঘটনাব ঘাত-প্রতিঘাত বিপুল বেগে চলিয়াছে। গ্রাম্য-ভাষা বহু স্থলে আছে, কিন্তু সেগুলি না থাকিলে চবিত্র পরিস্ফুট হইত না।

প্রায় প্রত্যেক নাটকেই এমন কতকগুলি চবিত্র আছে যেগুলি কতকটা খেয়ালী বা পাগলেব ছদ্মাববণে মহৎ চবিত্র। "জনা" নাটিকাব বিদূষক, "পাণ্ডবগৌববে" কঞ্চুকি, "শাস্তি কি শান্তি"ব পাগল, "ভ্রান্তি" নাটকে বঙ্গলাল প্রভৃতি এই শ্রেণীব চবিত্র। আবাব বাববণিতাব মনেও যে প্রচ্ছন্ন উচ্চভাব থাকে তাহাও গিবিশচন্দ্র তাঁহাব অনেক নাটকেই দেখাইয়াছেন। "হাবানিধি" নাটকে কাদম্বিনী নামে একটি পতিতাব চবিত্র আছে। মোহিনী-মোহন তাহাকে প্রলুব্ধ কবিয়া ঘবেব বাহিব কবে। বাহিব করিয়া আনিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস কবিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয। কাদম্বিনী যখন গঙ্গায় আত্মহত্যা কবিতে গিয়াছিল তখন হবিশেব পুত্র নীলমাধব তাহাকে বাঁচায়। কাদম্বিনীকে নীলমাধব "মা" বলিয়া ডাকিয়াছিল তাহাতেই কাদম্বিনীব মন আনন্দবসে পূর্ণ হইয়া গেল—

"তুমি আমায় মা বল্লেছ? তুমি অভাগিনীকে 'মা' বলে ডেকেছ,

গঙ্গাদেবী সাক্ষী,—জগন্মাতা রণে বনে দুর্গমে তোমার রক্ষা করবেন।” এই বলিয়া কাদম্বিনী আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া মোহিনীর উপর প্রতিশোধ লইবার উপায় খুঁজিতে চলিয়া গিয়াছিল। পরে সে হরিশের ও নীলমাধবের অনেক উপকার করে। কিন্তু কাদম্বিনী ষড়যন্ত্র করিয়া মোহিনীর নিকট হইতে স্বীকৃতিনামা (Affidavit) আদায় করিয়াছে নীলমাধব যখন জানিতে পারিল তখন মর্ম্মাহত হইল। বলিল, “তুমি যখন আত্মহত্যা করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলে আমি তোমার প্রাণরক্ষার জন্য গঙ্গাতীরে প্রতিশোধের কথা বলেছিলাম বটে, কিন্তু সে কি এই প্রতিশোধ? * * যদি প্রতিশোধের ইচ্ছা ছিল অন্য প্রতিশোধ কি নাই? যে তোমায় ঘৃণা করে ত্যাগ করেছিল, জগতের হিতে রত হয়ে তারে তুমি দেখাতে পারতে যে, তুমি মহতের অপেক্ষাও মহৎ। শত্রুর অনিষ্টের জন্য যে উৎসাহের তুমি প্রকাশ করেছ, ঈশ্বর উপাসনায় যদি তোমার সেই উদ্যম, সেই উৎসাহ থাকতো, তুমি দেবী হতে। কিন্তু এখন তুমি কি? যে তোমার অনিষ্ট করেছিল, তাতে আর তোমাতে প্রভেদ কি? অগ্র পশ্চাৎ!”

নীলমাধবের চরিত্র অতি অপূর্ব্ব। সে তাহার শত্রুগণকে ভালোবাসা দিয়াই হার মানাইয়াছে। মোহিনীকে তাহার একবারের কাগজগুলি ফিরাইয়া দিয়াছে, দুষ্টপ্রকৃতি গুণনিধিকেও তাহার বিপদের সময় সাহায্য করিয়াছে। যদিও সহজে ইহাদের মতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু অবশেষে সকলেরই মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

নীলমাধব, মোহিনীমোহনকে কাগজগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিল, “মশাই এ কাগজগুলি নিন, আমাদের বাড়ি সম্বন্ধে একবার আর কনভেয়ান্‌স্ (conveyance)।”

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কোথায় পেলে?”

নীলমাধব বলিল, “আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।” সেই মুহূর্ত্তেই মোহিনীর চৈতন্যের উদয় হইল। ভাবিল, “এই নীলমাধব, যে পরম শত্রুকেও হাতে পাইয়া আঘাত করে না। আর আমি? আমি হরিশের কিনা সর্ব্বনাশ করেছি, অথচ সেই হরিশ ছেলেবেলা থেকেই আমায় কত বিপদে বাঁচিয়েছে।

গহনা চুরি করে হরিশের ঘাড়ে দোষ দিলাম, বললাম হরিশের পরামর্শেই চুরি করেছি। সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবে গেলাম, বাড়ি এসে বললাম হরিশই আমাকে সাঁতার দিতে নিয়ে গিয়েছিল; দাঙ্গা করে বললাম হরিশের পরামর্শেই দাঙ্গা করতে গিয়েছিলাম, এদিকে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তার অস্থি চূর্ণ হল। সেই হরিশের ছেলেই তো এই নীলমাধব। হরিশের ছেলে যেমন হওয়া উচিত, তাই সে হয়েছে।"

এই পুস্তকে অঘোরের চরিত্রও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অতি অপূর্ব্ব, স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাই তাহার জীবনপথের নিয়ামক হইয়া তাহাকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উন্নত জীবনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

"মায়াবসান" নাটকে সাতকড়ি চাটুজ্যের চরিত্র আর এক দিক দিয়া অত্যাশ্চর্য্য। চাটুজ্যের একমাত্র আনন্দ, লোকের বিপদ ও দুঃখে। যে পরিবারে সকলে মনের মিলে আনন্দে আছে সেখানে কোনও উপায়ে বিবাদ বাধাইতে পারিলেই চাটুজ্যে পরমানন্দিত হন। এজন্য তিনি পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়াই মনে করেন না, অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই সৎকার্য্য সাধনের জন্য তিনি অ্যাটর্নি ও উকিলের সহিত বন্ধুত্ব করেন, পরামর্শ-দাতারূপে তাহাদের পথনির্দ্দেশ করেন, অনবরত আদালতে যাওয়া-আসা করেন।

কালীকিঙ্কর বসু একজন প্রবীণ ভদ্রলোক। বিজ্ঞান-সাধনার দিকে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ। তিনি নিজে অবিবাহিত, দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র, একটি ভাগিনেয় ও একজন বিধবা ভ্রাতৃবধূ, ইঁহারাই তাঁহার পরিবার। ভাইপো দুইটি এক বছরের ছোট বড়, অবিরত তাহাদের তর্ক ও সেই সূত্রে ঝগড়া লাগিয়াই আছে। এই ঝগড়ার সূত্র ধরিয়া মোকদ্দমা বাধাইবার জন্য সাতকড়ি চাটুজ্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অ্যাটর্নি কৃষ্ণধন বসুর বাড়ি

গেলেন। কৃষ্ণধন অবশ্য বিবাদ বাধিলেই খুশী, কিন্তু বলিলেন, "খুড়ো রয়েছেন, তিনিই সব মিটিয়ে দেবেন। আর যদি ঘরোয়া পার্টিশন হয়, খুড়োই মধ্যস্থ হয়ে করে দেবেন।"

কিন্তু সাতকড়ি নিরাশ হইবার পাত্র নহেন। তিনি অ্যাটর্নিকে বলিলেন, "আরে মশাই দেখুন না চেষ্টা করে, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? উকিলের বুদ্ধি কুমোরের চাক, যত ঘুরুবেন ততই ঘুরবে।"

কৃষ্ণধনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার তো বেশ হেড ক্লিয়ার দেখছি, আপনি কি করেন, মোক্তারী না ল' ব্রোকারী?"

সাতকড়ি। আমি কিছুর মধ্যেই নেই, অমনি পাগল ছাগল একটা পড়ে থাকি, একটু তেজারতি আছে, আর এই আপনাদের পাঁচজনের কাজকর্ম্ম করে বেড়াই, শুধু বাড়িতে পড়ে ঘুমিয়ে আর কি করব?"

"আপনার লাভ?"

সাতকড়ি। লাভ আর কি, আমি মশাই আমুদে মানুষ, টাকা যত হোক্ না হোক্ আমার আমোদ হলেই হল।

অ্যাটর্নি চমৎকৃত হইলেন, বলিলেন, "আপনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। মিস্‌চিপ্ ফর মিস্‌চিপ্‌স্ সেক—উই আর ফ্রেণ্ডস্, আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু।"

এই আমোদের জন্য সাতকড়ি বসু-পরিবারটিকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টায় প্রাণপণে লাগিয়া গেলেন। দুই ভাইয়ের বিবাদ বাধাইলেন, কালীকিঙ্কর-বাবুকে পাগল প্রমাণ করিবার জন্য ডাক্তারের সাহায্য ও ঔষধের সাহায্য লইলেন। কালীকিঙ্করবাবুর রিসার্চের কাগজগুলিও চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কেননা জানিতেন সেগুলি কালীকিঙ্করবাবুর নিকট বহুমূল্য ধন।

কিন্তু তাঁহার চুরি করা হইল না। চাবি পড়িয়া আছে দেখিয়া যখন চাবি লইয়া বাক্স খুলিতে যাইবেন তখন কালীকিঙ্করবাবু বলিয়া উঠিলেন, "কে ও, চাটুজ্যে?"

সাতকড়ি। আজ্ঞে—আজ্ঞে।

কালী। ভয় করছ কেন? কি চাও নাও। আমি কিছু বোলব না।......

সাত। আজ্ঞে না, আমি টাকাকড়ি চাইনে।

কালী। তবে, তবে কি চাও? যা চাও বল, আমি এখনি দিচ্ছি। কেবল একটি কথা আমায় সত্য বল, তোমারও তো বয়েস হয়েছে; মানব-জীবনে কি দেখলে—লাভালাভ কিছু বুঝলে? কি চাও—নাও, আমার কথার উত্তর দাও।

সাত। আজ্ঞে আমি টাকাকড়ি নিতে আসিনি। এতে যে টাকাকড়ি নাই, তা আমি জানি। এ বাক্সটা কেবল আপনার হাতে টোকা কাগজে ভরাট, সেই কাগজগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেলব মনে করেছিলাম।

কালী। তাতে তোমার লাভ?

সাত। আজ্ঞে, আপনার টাকায় দরদ নাই, স্ত্রীলোকে দরদ নাই, মান-সম্ভ্রমের খাতির করেন না—দরদের ভিতর এক, ভাইপো, ভাইপো বৌ, আর রঙ্গিণী। আর বলেন তো এক ভাগনে। তা তাঁরা তো নিরুদ্দেশ, ভাগনেটিও ভাবে বুঝছি—কোন দিন চম্পট দেন। তা হলেই এদিক একরকম ফুরুল, আর দরদের ভিতর দেখেছি, আপনার বিদ্যার আর ঐ কাগজগুলির। * * তাই ভেবেছিলাম ঐগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেলব।

কালী। তোমার লাভ তো বুঝতে পারলাম না।

সাত। আজ্ঞে, ছেলেবেলায় মাস্টার গল্প করেছিলেন—'কে একজন ফরাসী পণ্ডিত রুকো ফুকো তাঁর নাম, তাঁর মতে পরের দুঃখেই মানুষের আনন্দ।' আমি কথাটি শুনে আমার মনের কথা বুঝতে পারলেম, জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের হাত এড়াবার যো নাই। তারপর দেখলেম, আর একজন দুঃখ পাচ্ছে, তখন প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হল, তাই দুঃখে সুখে এই আনন্দে বেড়াই।

কালী। ঐ কাগজগুলি যথার্থই আমার অতি যত্নের সামগ্রী ছিল। সমস্ত রাত্রি জেগে দূরবীক্ষণে আকাশে তারার প্রতি লক্ষ্য করেছি, অণুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যবহার দেখেছি, বিজ্ঞানচর্চ্চায় জীবন উপেক্ষা করে তাড়িত পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা. নিজ দেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি। যা যা দেখেছি, যা যা বুঝেছি, সব ঐ কাগজে টুকে রেখেছি—কেন জান?

ভেবেছিলাম, এ প্রকাশ করলে মানুষের উপকার হবে, কিন্তু আজ বুঝেছি যে, মানব-দুঃখের এক কণাও কমবে না।

এবার সাতকড়ি কাগজ না লইয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, কেননা সে বুঝিতে পারিয়াছে ঐ কাগজের উপর এখন আর কালীকিঙ্করবাবুর কোন মমতা নাই।

কালীকিঙ্করবাবু যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মনে কর, যারা পরের উপকার করে, তারা আহম্মুখ।" উত্তরে সাতকড়ি বলিল, "তা নয়, তবে যার যা সখ, যে যাতে আমোদ পায়।"

কালীকিঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন, পরের অনিষ্টই এর জীবনের ব্রত। কিন্তু আশ্চর্য্য, একে তো একদিনও বিমর্ষ দেখি না।

"মায়াবসানে" সমস্ত চরিত্রের মধ্যে যেটি বিশেষ চরিত্র সেটি 'রঙ্গিণী' নামে একটি মেয়ের চরিত্র। রঙ্গিণীর পরিচয় সে বিন্দিবৈষ্ণবীর কন্যা। বিন্দি ও তাহার শিশু-কন্যাকে নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় কালীকিঙ্করবাবু ও তাহার দেবীসমা ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ অন্নপূর্ণা আশ্রয় দেন। সেই হইতে রঙ্গিণী প্রথমে তাহাদের আশ্রিতা পরে কালীকিঙ্করবাবুর কন্যাতুল্যা, ছাত্রী ও শিষ্যারূপে দিনে দিনে তাঁহারই শিক্ষায় মনোবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

বসু পরিবারে বহু বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। যাদব ও মাধব দুই ভাই পরস্পর-বিরোধ করিয়া মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহারা অ্যাটর্নি ও উকিলের এবং চাটুজ্যের পরামর্শে কাকাকে পাগল করিতে গিয়া বিষাক্ত ঔষধ খাওয়াইয়াছে এবং সেই ঔষধ তাহাদের মাতৃসমা অন্নপূর্ণার হাত দিয়াই ঔষধ বলিয়া খাওয়ানো হইয়াছে; তাহার পর অন্নপূর্ণার নামে বিষ খাওয়ানোর অভিযোগে তাহাকে পুলিসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। রঙ্গিণীও এই ষড়যন্ত্র-জালের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। কিন্তু নানা বিপদে

পড়িয়াও তাহার মনের বল ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং তাহাব নির্ম্মল চবিত্রে বিন্দুমাত্র কালিমা স্পর্শ কবে নাই। সে কালীকিঙ্করবাবুকে বিষাক্ত ঔষধ পানেব পব শুশ্রূষা কবিয়া সুস্থ কবিয়া তুলিয়াছে এবং তাঁহাব মানসিক সুস্থতা যাহাতে ফিবিয়া আসে, অবিবত সেই চেষ্টা কবিযাছে। তাঁহাকে বলিয়াছে, ছোটবাবু, তুমি একটু চেষ্টা কব, আবাম হবাব জন্য ইচ্ছা কব, তা হলেই আবাম হবে।'

মানুষ কেন পাগল হয়? কালীবাবু বঙ্গিণীকে বলিয়াছেন, 'মানুষ পুত্রশোকে পাগল হয়, কেননা ভালো হলে তাব ছেলেকে মনে পড়বে, সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পাগল হয়, বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা, পবমাত্মীয়েব শত্রুতা এসমস্ত ভোলবাব জন্যই লোকে পাগল হয়, সুস্থ হ'তে সে চায় না।'

বঙ্গিণী তাঁহাকে বলিয়াছে, 'ছোটবাবু, সংসাবে যদি অকৃতজ্ঞতা না থাকতো, তা হলে কৃতজ্ঞতাব কিসেব আদব? অধর্ম্ম যদি না থাকতো, তবে প্রকৃত ধর্ম্মেব আদব কিসেব? অসত্য যদি না থাকতো, তা হলে সত্যেব আদব কিসেব?' রঙ্গিণী আবও বলিল, 'যন্ত্রণা এড়াবাব ভয়ে পাগল হয়ে মববে এই কি তোমাব ইচ্ছা? আমাব ভগবানেব কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, যদি একদিন ভালো হয়ে তাব পবদিনই তোমাব মৃত্যু হয়, ভগবান যেন তাই কবেন। ** ছোটবাবু, তোমাব জন্য আমাবও বড় যন্ত্রণা, কিন্তু পাগল হব না,—তুমি যন্ত্রণাব ভয় কব, তাই তুমি আবাম হতে চাও না, কিন্তু তোমাবই শিক্ষায় আমাব যন্ত্রণাব ভয় নাই, যন্ত্রণাতেই আমাব আনন্দ।'

কালীকিঙ্কব জিজ্ঞাসা কবিলেন, "ভাল হযে কি কবব? আব যদি পবেব উপকাব করি, তাতে আমাব লাভ কি?"

উত্তবে বঙ্গিণী বলিল, "ছোটবাবু এ-কথাব উত্তব তো তুমি আমায় শিখাওনি! **তুমি আমাকে শিখিয়েছ, যে লাভেব কথা ভাবে, সে ধর্ম্মপথে চলিতে পাবে না, সত্য বলতে পারে না, পরোপকার ক'রতে পাবে না, আমি তাই শিখেছি।"

ইহাব পর কালীকিঙ্কর বঙ্গিণীকে প্রশ্ন করিলেন, "ভালো হব?"

বঙ্গিণী বলিল, 'হাঁ'। আবাব প্রশ্ন কবিলেন, "তুমি সত্যি সত্যি বল আমি ভালো হ'য়েছি?" রঙ্গিণী উত্তবে দৃঢ়ভাবে বলিল, "আমি সত্যি বলছি, তুমি

ভালো হয়েছে।' কালীকিঙ্করবাবু সেই মুহূর্তেই অনুভব করিলেন, তিনি পূর্ব্বের মতই সম্পূর্ণভাবে মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোবল লাভ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, রঙ্গিণীর উপর তাঁহার কতটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল।

কিন্তু রঙ্গিণী নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িল। হৃদযন্ত্রের দুর্ব্বলতায় তাহাকে শয্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। কালীকিঙ্করবাবু তাহাকে বাগানের ভিতরের নির্জ্জন বাড়িতে আনিয়া রাখিলেন এবং শুশ্রূষার জন্য নিজেও সেখানে থাকিলেন। এই বাড়িতেই তাঁহার দুই ভাইপো পুলিসের হাতে গ্রেপ্তারের ভয়ে তাঁহার কাছে আশ্রয় লইতে আসিল। বলিল, "কাকাবাবু আমাদের বাঁচান। পরের পরামর্শে আমরা এসব অন্যায় কাজ করেছি।"

কালীকিঙ্কর বলিলেন, "পরের পরামর্শে ভাইকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা ক'রেছ, খুড়োকে বিষ দিয়েছ, বড় ভাজকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছ, আর আপনার লোকের পরামর্শ বালক-কাল থেকে শুনেও বোঝনি যে এসব কুকাজ? ** জেলের ভয়ে অস্থির হয়ে আমার পায়ে ধরতে এসেছ, আর সেই জেলে বড ভাজকে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলে? ** তোমাদের সাহায্য করা মহাপাপ,—সমাজবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ পাপ।" বলিয়া তাহাদের যখন কোন সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন তাঁহার পুরাতন চাকর শান্তিরাম বলিল, "** এরা দুর্জ্জন, এদের সাজা দিতি চাও, আর এদের যে রে দিয়ে এনেছ, সেডা মনে রাখ। ** মনের পচা পাঁক উটকে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জ্জন বল্‌তোনি। প্যাটের ছেলে ডরিয়ে আইসে পায় ধরতিছে, আর পা ঝিনকুটে ফেলতিছো?" **

রঙ্গিণী দুই ভাইয়ের আর্ত্তনাদ শুনিয়া রুগ্ন শয্যা হইতে উঠিয়া আসিল, ও ব্যাপারটি দেখিল। কালীকিঙ্কর যখন বলিলেন, "পাপের দণ্ড হয়েছে, তুমি কি করবে?"

রঙ্গিণী। "পাপের দণ্ড! মার্জনা নাই? তবে তো মানবদেহ ধারণ মহা বিপদ। যদি মার্জ্জনা না থাকে, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব? এজীবন কার্য্যপ্রবাহ, সকল কার্য্যই কোন না কোনভাবে কলুষিত, যদি দণ্ড হয়, মার্জ্জনা না থাকে, তাহলে তো অনন্তকালেও নিস্তার নাই।"

কালী। "কে বললে মার্জ্জনা নেই? ভগবান অপরাধভঞ্জন, তিনি মার্জ্জনা করেন।"

রঙ্গিণী। "তবে কি মার্জ্জনা কেবল মানুষের নিষেধ? ** যদি মানুষের মার্জ্জনা নিষেধ হয়, তাহলে এমন হীনজন্ম আর নাই।"

কালীকিঙ্কর বুঝিলেন যে, তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়াছিলেন, তাই সকল দিক ভাবিয়া দেখেন নাই। তিনি বুঝিলেন যে, 'এখন প্রতিহিংসাই বিচারকের আসন গ্রহণ করেছিল, তাই সত্যের দোহাই দিয়ে ভয়ার্ত্ত বালকদের মার্জ্জনা করি নাই।'

এই গ্রন্থে বহু চরিত্র আছে। প্রত্যেক চরিত্রেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার ভিতর একটি চরিত্র গণপতি। গণপতি শর্ম্মা ব্রাহ্মণ, প্রকাশ্যে গণকের কাজ করেন, ভিতরে ভিতরে এমন মহা দুষ্কর্ম্ম নাই যে, তিনি করিতে পারেন না। তাঁহার কথায় একটি মুদ্রাদোষ আছে, 'বিবেক করুন গে।' তাঁহার নিকট একটি বিষবড়ির থলি থাকিত, সেই থলির বড়ি বহু দুষ্কৃতিকারীর প্রয়োজনসাধনে লাগিত এবং গণপতির অর্থলাভ হইত। এই গণপতিই রঙ্গিণীর সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ নূতন মানুষ হইয়া গেল এবং শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, সে বিষবড়ির থলি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়া নিজে দুটি বড়ি খাইয়া আত্মহত্যা করিল।

গণ। "এই দুটো পেটে যাও, আর এই থলে শুদ্ধ মা গঙ্গা নাও।"

হলধর। "ভটচায, কি করলে, কি করলে?"

গণ। "বিবেক করুন গে, বিষের থলেটা গঙ্গায় দিলেম, আর দুটো উদরে দিলেম, এই স্ত্রীহত্যাটা আমা হতেই হয়েছে। * * বিবেক করুন গে—থলিটা মা গঙ্গা নিলেন, ওতে কম ক'রে হাজার ঘর উৎসন্ন যেতো,—আর এ জড় থাকলে হাজার থলি সৃষ্টি হ'তো, বংশপরম্পরা বিদ্যেটা চলতো।"

বইখানির নাম "মায়াবসান"। গ্রন্থকার দেখাইতে চাহিয়াছেন, সৎকার্য্য ও পরোপকার প্রভৃতিও একটি মায়া, অর্থাৎ বাহিরে পুণ্যের আবরণ থাকিলেও ভিতরে থাকে আত্মশ্লাঘা, খ্যাতি কামনা, নিজেকে বড় করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি। গ্রন্থশেষে কালীকিঙ্কর আত্মবিশ্লেষণ করিয়া যে সত্যটি লাভ

করিয়াছেন, সেটি তাঁহার কথায় 'মুখে যতই বলি নিষ্কাম কর্ম্ম, কিন্তু অভিমান, ফলকামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্য পরহিত করেছি, ফলকামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জ্জন দিয়ে পরকার্য্যে রইলেম, পর-আপনবোধ বিসর্জ্জন দিয়ে পরকার্য্যে রইলেম, রইলেম কি—জগতে মিশ্‌ নম।'

"তপোবল" গ্রন্থে আছে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য দুষ্কর তপস্যার ইতিহাস। বিশ্বামিত্র তপস্যায় এমন ক্ষমতা লাভ করিলেন যে, তিনি নূতন স্বর্গসৃষ্টি নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিতেও সমর্থ হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। 'কি ব্রাহ্মণত্ব?' ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অরুন্ধতী স্বামী বশিষ্ঠকে ব্রহ্মতেজ সংবরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে বশিষ্ঠ যখন বলিলেন, "আমি তেজ সম্বরণ করলে অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় এখনি আমায় বধ করবে।" উত্তরে অরুন্ধতী বলিলেন, "প্রভু ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণের জন্মমৃত্যু আছে, তা তো কই শ্রীমুখে শুনিনি।"

অন্যত্র, 'ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম ব্যতীত কি ব্রাহ্মণ হয়?' বিশ্বামিত্রের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মন্যদেব বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মেও চণ্ডাল হয়। * * যে তপস্যায় আত্মদর্শন করে, সেই ব্রাহ্মণ।"

স্বভাবত মানুষ মৃত্যুভয়ভীত, দুর্ব্বল, ও কাপুরুষ, কিন্তু তবুও সে পৌরুষেরই পূজক, মানুষ স্বার্থপর, আত্মস্বার্থ ব্যতীত সে অন্য কিছু কল্পনাও করিতে পারে না, কিন্তু সাহিত্যের তুলিকায় অঙ্কিত মহাবীরগণের কাহিনী, মহান আত্মত্যাগীর কাহিনীই তাহার মনকে পরিতৃপ্ত করে। সে যেন সেই সকল চরিত্রের ভিতর ডুবিয়া নিজের 'হারানো আমি'র সন্ধান পায়। এই পথেই সাহিত্যের সার্থকতা।

আবার অন্যদিকে আছে চিকিৎসকের রোগনিদান নির্ণয়ের ন্যায় সাহিত্যিকের মনোবিশ্লেষণ।

"জনা" নাটিকার হরিভক্ত নীলধ্বজ রাজা। তাঁহার বিশ্বাস তিনি হরিভক্ত, এবং হরিভক্ত বলিয়া নিজের সম্বন্ধে অভিমানও তাঁহার আছে। রানী জনা একস্থলে তাঁহাকে বলিতেছেন:

"ধন্য ধন্য কৃষ্ণভক্তি তব!
কৃষ্ণভক্ত ছিল না কি শান্তনুনন্দন?
জানিত সাক্ষাৎ নারায়ণ,
জানিত নিশ্চয় পরাজয়,
তবু—বীরপণে ধরি ধনুর্ব্বাণ
হরি-বক্ষে করিল সন্ধান।
মুরারির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল
রথচক্র ধরাইল কুরুক্ষেত্র রণে।
* * *
হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার!"

"কালাপাহাড়ে" চিন্তামণির উক্তিতে মানবমনস্তত্ত্বের পরিচয় এইভাবে দেওয়া হইয়াছে, "নিঃস্বার্থ তো দয়া, পরের উপকার। তবে ভাই শোন। আবার দয়া আছে, দয়া করে যদি কারুকে কিছু দিই তো মনে হয়, যদি একটা মেলা হতো, লোক জড় হয়ে দেখত। কারুকে কিছু যদি লুকিয়ে

দিই, মনে হয় আমি না হয় লুকিয়ে দিচ্ছি, আব পাঁচজন দেখলে তো তাদেব চোখে আগুন লাগত না। যদি কখনও কারুব উপকাব কবি, আর সে যদি জন্মেব মতো আমাব গোলাম না হয়, অমনি বাগেব পবিসীমা থাকে না। বলি, বেইমান! শয়তান! অকৃতজ্ঞ!"

"নসীবাম" নাটকে বাজপুত্র অনাথনাথ নসীবামকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিল, "নসীবাম, তোমাব সংসাবে চাইবাব কিছু নাই?"

উত্তবে নসীবাম বলিয়াছিল, "চাইবাব মতো জিনিস একটা দেখিয়ে দাও তো, পাই না পাই তবু একবাব চাই। সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব সুন্দবী ছুঁড়ি পুডে ছাই হবে, লোকজন কে কোথায় যাবে তাব ঠিকানা নাই। টাকাকডি আজ বোলছো তোমাব—তোমাব হাত থেকে গেলেই ওব, আবাব ওব হাত থেকে তাব। না যদি খবচ কব তো দু'হাতে দু'মুঠো ধূলো ধব না কেন, বল এই আমার টাকা, এই আমাব টাকা।"

"মনেব মতন" নাটকে ফকীব। "যন্ত্রণাব হাত হতে নিস্তাব পেতে চাও, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মেছ কেন? প্রস্তব হতে পাবতে, তাহলে কোনো যন্ত্রণাই উপভোগ ক'বতে হ'তো না। মানবজীবনে যন্ত্রণাই পবম বন্ধু। যদি দুঃখকে আদব ক'বে সুখকে প্রত্যাখ্যান কবতে পাব তাহলে দেখবে যাকে তুমি সুখ বল, সে বাঁদীর মতো তোমাব পিছনে পিছনে ঘুবছে।"

গিবিশচন্দ্রেব প্রত্যেকটি নাটকেই বহুবিচিত্র চবিত্রচিত্রেব ভিতব জীবন-সমস্যা সমাধানেব ইঙ্গিত আছে। এখানে তাঁহাব জন্মভূমি সম্বন্ধে একটি

রচনা, ও দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দিয়া প্রবন্ধটি শেষ করিতেছি।

প্রবন্ধটি 'কুসুমমালা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গরুড়' নামে একটি প্রবন্ধ। "পুরাণে শুনি গরুড় মাতার দাসীত্ব মোচন করিবার জন্য সুধা আনিতে যাত্রা করেন, পথে দেবসেনার সহিত ঐরাবত আরোহণে দেবরাজ ইন্দ্র বিরোধী হন। মাতৃবৎসল বিহঙ্গরাজ বজ্রধারী ইন্দ্রকেও জয় করেন, বজ্রাঘাতে তাঁহার একটিমাত্র পালক খসে। চক্রধারী বিষ্ণুও তাঁহার গতিরোধে সমর্থ হন না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গিরিশচন্দ্র মাতৃভূমির দাসীত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও সেই সঙ্গে গ্যারিবল্ডির কথা তুলিয়া বলিয়াছেন, "ইতিহাস বলে, যখন গ্যারিবল্ডি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিতেন, তখন আপাদমস্তক অরিশোণিতে পরিপ্লুত অবস্থায় ফিরিতেন, দুর্গম রণসন্ধি মাঝে শত্রুর অস্ত্র তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিত না। মায়ের বীর সন্তান, মাতৃভূমির দুঃখে একান্ত বিকল, সেই দুঃখই তাঁহার সহায়, অপর কাহারও সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেন না। জননীবৎসল কৃষক জগন্মান্য গ্যারিবল্ডি হইয়াছিলেন।"

তিনি দোকানীর ছেলে গ্যাম্বেটার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "গ্যাম্বেটা দোকানদারের ছেলে। আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু একান্ত জন্মভূমি-বৎসল। কেহ কেহ বলেন তাঁহার কোন বিশেষ গুণ ছিল না। কিন্তু মহাগুণসম্পন্ন হইয়াও, কেহ ইঁহার অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারেন নাই। যখন ফ্রান্সে সম্রাটসৈন্য সিডন-সমরে পরাজিত হইল, মেট্ বিপক্ষ-পদে লুণ্ঠিত হইল, প্যারিস নগরী লৌহ-বেষ্টনে আবদ্ধ ও অনলবর্ষণে জর্জ্জরীভূত এই দোকানীর ছেলে তখন কি কার্য্যই না সম্পন্ন করিয়াছেন?"

"ফ্রান্স যখন অস্ত্রধারীরহিত—গ্যাম্বেটার উৎসাহে যেন মন্ত্রবলে সৈন্য সৃষ্টি হইল, কঠিন জার্ম্মন-হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত ফ্রান্স নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল।"

"যুদ্ধবিদ্ মাত্রেরই অভিমত এই যে, প্যারিস যদি কুলাঙ্গার কর্তৃক পরিত্যক্ত না হইত, প্যারিস রক্ষকেরা মরণে কৃতসঙ্কল্প থাকিত, তাহা হইলে জীনাজয়ী ফ্রান্সকে বিসমার্কের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইত না। সন্ধি স্থাপনের পর সকলেই ভাবিল ফ্রান্স আর ইউরোপে প্রাধান্য পাইবে না, কিন্তু

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত গ্যাম্বেটা অচিরে আশার অতীত কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ফিনিক্স পক্ষী যেমন অগ্নি হইতে নবকলেবর ধারণ করিয়া উঠে, গ্যাম্বেটার মন্ত্রবলে ফ্রান্স সেইরূপ উঠিল। সভয়ে জার্ম্মনি দেখিতে লাগিল, ফ্রান্স আর ঋণগ্রস্ত দুর্দ্দশাপন্ন নয়, লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী তাহার রক্ষার্থে প্রাণ দিতে উৎসুক। ফ্রান্সের রাজনীতি সমস্ত ইউরোপের ঈর্ষ্যার কারণ হইল। অসামান্য রণকৌশলসম্পন্ন নেপোলিয়নের পদতলে প্রুসিয়া বিনাযুদ্ধে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। জয়ী বীরদম্ভে নিয়ম করিয়া দিলেন, প্রুসিয়া চল্লিশ সহস্র অস্ত্রধারীর অধিক সৈন্য রাখিতে পারিবে না। ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্লুচারের সৈন্যগণ যখন ইংরাজ সৈন্যের সহিত সখ্যভাবে হস্তধারণ করে তখন প্রুসিয়ার অত্যন্ত দৈন্যদশা। সেনার জুতা নাই, পরিচ্ছদ নাই, উপযুক্ত অস্ত্র নাই, তাহাতে আবার নেপোলিয়নের লৌহ নিয়মে অতি অল্প সৈন্যই রণক্ষেত্রে আসিতে পারে, প্রুসিয়ার সেই একদিন! কিন্তু মাতৃমন্ত্রবলে প্রুসিয়ার সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গেল, সমস্ত প্রুসিয়া কৃতসকল্প হইল যে, পাঁচ বৎসর প্রুসিয়ার প্রত্যেক নাগরিকই অস্ত্রধারণ করিবে।"

"পরাজিত প্রুসিয়া গোপন সাধনায় কি দুর্দ্দম হইয়া উঠিল! যে অষ্ট্রিয়ার ভয়ে সদাই কম্পিত সেই অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কামানের বজ্রনাদে সন্ধির নিয়মাবলী লিখাইল।"

"মাতৃমন্ত্রের এই শক্তি, এ কি ইউরোপেরই নিজস্ব? তাহা নয়। ভারতবর্ষে রাণা প্রতাপ মাতৃ-উপাসক। ইতিহাসে শুনি তাঁহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও গৌরববর্দ্ধক। * * *"

ভারতবর্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টা কেন সফল হয় নাই, ইহা লইয়া নাটকের পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া গিরিশচন্দ্র কিছু কিছু বলাইয়াছেন, "বৈষ্ণবী" নাটকে রণেন্দ্রনাথের উক্তিতে:

"হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ,—
আত্মশ্লাঘা, দ্বেষ হিংসা পরস্পরে,
উচ্চনীচ জাতি অভিমান
দৃঢ়ীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশ—

ধর্ম্ম অভিমানে
স্বজাতি বান্ধব পরিত্যাগ।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা
স্বার্থপর ব্রাহ্মণের মুখে।"

ফকিররাম। "বাবা, বীরত্বের অহঙ্কারেই হিন্দু জাতির পতন হয়েছে। তুমি নেতা, কিন্তু সৎনামের জয় পরাজয়ের কথা ভাবলে না, বীরত্ব জানিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বসলে যে কারতলব খাঁর সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে যদি তোমার পরাজয় হয় তবে সৎনামের পরাজয় স্বীকার করতে হবে। এই রকম বীরত্ব করে রাজপুতেরা বারুদ ব্যবহার করতে চান নি আর মুসলমানেরা ঘুমন্ত লোকের বুকে ছুরি চালালে, আর বীরত্বের গর্ব্ব না করে কামানও চালালে। হিন্দুরা বীরত্ব ধুয়ে খেলেন, রাজ্য দিলেন। * * * মুসলমানের গুণ কি জান? তারা কার্য্যসিদ্ধি চায়, আত্মগৌরব চায় না। ছলে বলে কৌশলে বাদশার কার্য্য হলেই হল, তোমার মতো বীরত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করে না।"

রণেন্দ্র। "মহাশয়, আপনার কি আজ্ঞা, মুসলমানের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে?"

ফকিররাম। "না, দেশের কর্তব্য সাধন করতে হবে। রামভক্ত হনুমান কৌশলে রাবণের মৃত্যুবান হরণ করেছিলেন। দেশের কার্য্যে আত্মাভিমান ত্যাগ করাই উচিত।"

"বৈষ্ণবী" নাটকে গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, রণেন্দ্রের চিত্ত-দুর্ব্বলতাই সৎনামী সম্প্রদায়ের পরাজয়ের কারণ হইযাছিল।

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-অঙ্কন-নিপুণতার পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবং আমার মতো অক্ষমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, তাঁহার এক একখানি নাটক পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনার ভার যদি কোনো সুলেখক গ্রহণ করেন তবে হয়তো সেই মহাকবির রচনার সৌন্দর্য্য ও আদর্শের কতকটা পরিচয় দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে।